সেইসব দার্শনিক

সরদার ফজলুল করিম

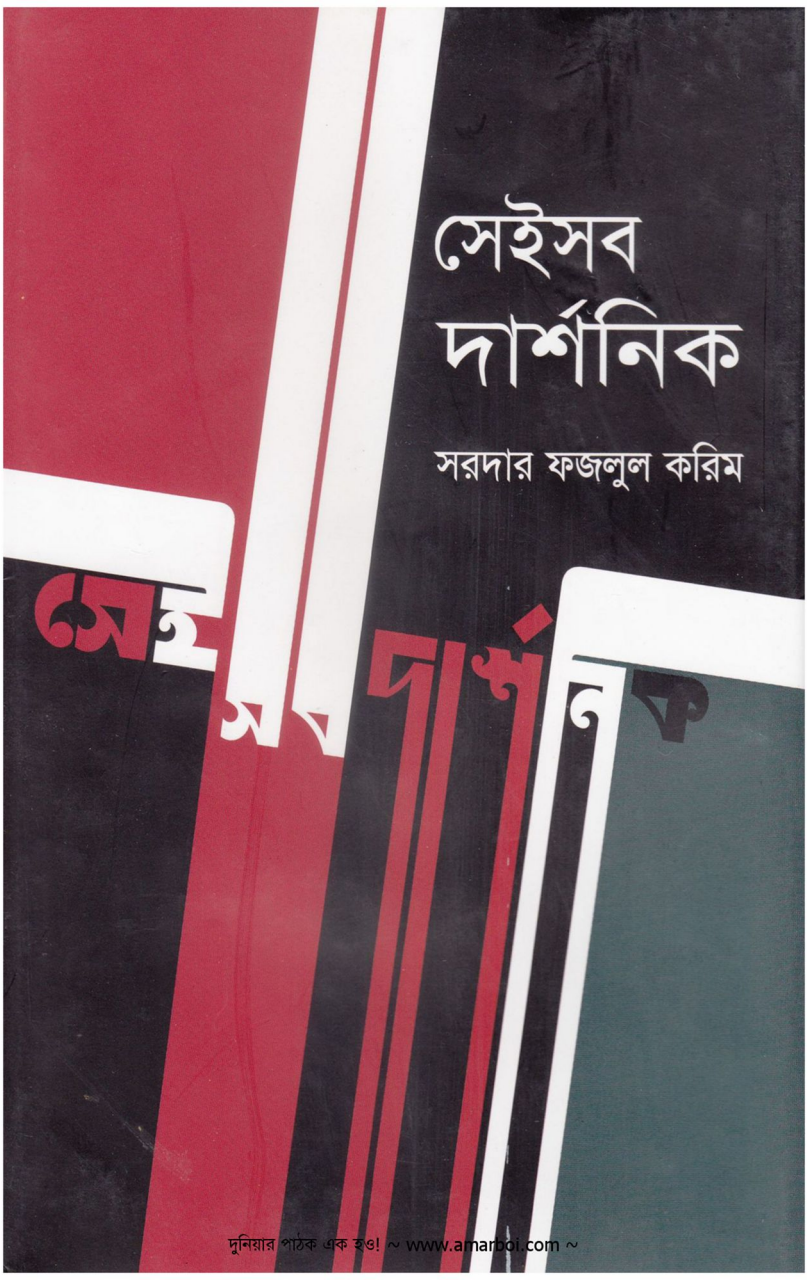

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সেইসব দার্শনিক' মূলত বিশ্বসেরা দার্শনিকদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত বই। দার্শনিকগণ জগৎ ও জীবনের কারণ নিয়ে নির্মোহ অনুসন্ধান করেছেন এবং মানুষের পৃথিবীকে জ্ঞানের আলোয় প্রস্ফুটিত করে গেছেন। দার্শনিক এপিক্যুরাস থেকে ভি আই লেনিন পর্যন্ত কী ধরণের দর্শনতত্ত্ব ছিল তা-ই বইটির মূল বিষয়।

খুব সাবলীলভাবে দার্শনিকদের গভীর দর্শন ও মৌলিক চিন্তা উপস্থাপনের মাধ্যমে বইটি সবার পড়ার উপযোগী করে তুলেছেন লেখক। যেমন সক্রেটিসের ক্ষেত্রে এক কথায়ই অনেক বলা হয়ে যায় লেখরে ভাষ্য অনুযায়ী : 'প্রশ্নোত্তরের এ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ছিল সক্রেটিসের জ্ঞান আলোচনার প্রধান পদ্ধতি।' এভাবে অন্যান্য দার্শনিকের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে বইটিতে। দার্শনিক এপিক্যুরাস সম্পর্কে বলা হয়েছে– 'জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের জীবনযাপনে এমন নীতি স্থির করা যে নীতিতে মানুষ সত্যিকার শান্তিলাভে সক্ষম হবে।' এসব দার্শনিকদের চিন্তা একটি সূত্রে বেঁধে ফেলার সর্বাত্মক ও চূড়ান্ত প্রচেষ্টা– 'সেইসব দার্শনিক' শীর্ষক গ্রন্থ। বইটি পাঠকদেরকে চিন্তার বিকাশে আরো এক প্রস্থ এগিয়ে নিয়ে যাবে; নিয়ে যাবে তাদের ভাবনার সুদূরে।

প্রচ্ছদ | সব্যসাচী হাজরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরদার ফজলুল করিম। ১৯২৫ সালের ১ মে বরিশালের আটিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা : খবিরউদ্দীন সরদার। শিক্ষা : মাধ্যমিক, বরিশাল জিলা স্কুল (১৯৪০); উচ্চ মাধ্যমিক, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (১৯৪২); স্নাতক সম্মান (দর্শন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৬)। তিনি ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শণ বিভাগে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যক্ষ, বাংলা একাডেমী (১৯৬০-১৯৭১)। সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭২-১৯৮৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ : দর্শনকোষ, প্লেটোর সংলাপ, প্লেটোর রিপাবলিক, এ্যারিস্টটলের পলিটিক্স, এঙ্গেলস-এর এ্যান্টিডুরিং, নানা কথা, নানা কথার পরের কথা, রুমীর আম্মা, নূহের কিশতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূর্ববঙ্গীয় সমাজ, চল্লিশের দশকের ঢাকা, গল্পের গল্প, যুক্তিবিদ্যা, সেই সে কাল : কিছু স্মৃতি কিছু কথা, ইতিহাস কোষ, আমাদের সাহিত্য, আমি মানুষ ইত্যাদি। পুরস্কার : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৭) ও স্বাধীনতা পদক (শিক্ষা) ২০০০ খ্রিস্টাব্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেইসব দার্শনিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেইসব দার্শনিক

সরদার ফজলুল করিম

কথাপ্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

যিনি আমাকে ছেড়ে গিয়েও যাননি
সেই স্মৃতির কুসুম মালিকার
সুলতানা রাজিয়ার উদ্দেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাঁরা আমার জীবনের জীবন সেইসব দার্শনিক নিয়ে এই বই। যারা বইটি প্রকাশ করেছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার জীবন দিয়ে।

সরদার ফজলুল করিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

এপিক্যুরাস [৩৪১-২৭০] ১১
সক্রেটিস [৪৬৯-৩৯৯] ৩৪
প্লেটো [৪২৮-৩৪৭] ৩৬
এরিস্টটল [৩৮৪-৩২২] ৪৮
নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি [১৪৬৯-১৫২৭] ৬৯
টমাস হবস [১৫৮৮-১৬৭১] ৭১
রেনে দেকার্ত [১৫৯৬-১৬৫০] ৭৩
জন লক [১৬৩২-১৭০৪] ৭৫
বারুচ দ্য স্পিনোজা [১৬৩২-১৬৭৭] ৭৭
জ্যাঁ জ্যাক রুশো [১৭১২-১৭৭৮] ৭৯
ইমানুয়েল কান্ট [১৭২৪-১৮০৪] ৮৭
হেগেল [১৭৭০-১৮৩১] ৮৯
কার্ল মার্কস [১৮১৮-১৮৮৩] ৯১
ফ্রেডারিক এঙ্গেলস [১৮২০-১৮৯৫] ৯৮
ভি আই লেনিন [১৮৭০-১৯২৪] ১০২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এপিক্যুরাস

প্রাচীন গ্রিসের বস্তুবাদী দার্শনিক এবং নীতিশাস্ত্রের এপিক্যুরানিজম বা প্রাচীন সুখবাদের প্রতিষ্ঠাতা। প্রাচীন গ্রিসে এপিক্যুরানিজমের প্রতিদ্বন্দ্বী মত ছিল স্টয়েসিজম বা বৈরাগ্য। এপিক্যুরাস (৩৪১-২৭০ খ্রি. পূ.) একনিষ্ঠ জ্ঞান-গবেষক ছিলেন। ৩১০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে তিনি মাইটিলেন নামক স্থানে তাঁর দর্শনাগার প্রতিষ্ঠা করেন। সুখবাদ বলতে নির্বিচার ইন্দ্রিয়াসক্তি এবং স্থূল সুখভোগের ধারণা এপিক্যুরাসের নীতিবাদের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। কিন্তু এপিক্যুরাসের নিজের জীবনের মিতব্যবহার, সরল জীবনযাপন এবং সুখ সম্পর্কে তাঁর নিজের ব্যাখ্যা এরূপ ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীতে আকৃষ্ট হয়ে গ্রিসের সর্বস্থান হতে দর্শন শিক্ষার্থীগণ তাঁর শিক্ষাগারে এসে জমায়েত হতে থাকে। এদের মধ্যে প্রভুদের প্রাসাদের নর্তক এবং দাস সম্প্রদায়ের লোক, এমনকি মহিলাদের সাক্ষাৎও পাওয়া যায়।

নীতিবাদই এপিক্যুরাসের দর্শনের মূল। তাঁর কারণ, এপিক্যুরাস মনে করতেন, জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের জীবনযাপনের এমন নীতি স্থির করা যে নীতিতে মানুষ সত্যিকার শান্তিলাভে সক্ষম হবে। যথার্থ দর্শনের কাজ হবে মানুষের জীবনের যন্ত্রণা নিবারণ করা। মানুষের যথার্থ শান্তি কিসে? এ প্রশ্নের উত্তরের পূর্বে স্থির করতে হবে মানুষের কর্মের মূল চালক কি? এপিক্যুরাসের মতে মানুষের কর্মের উৎস হচ্ছে সুখের আকাঙ্ক্ষা এবং দুঃখকে পরিহার। মানুষ স্বভাবগতভাবেই সুখের কামনা করে, সুখের অন্বেষণ করে এবং দুঃখকে পরিহার করতে চায়। কিন্তু যে কোনো সুখই সুখ নয়। আপাত দৃষ্টিতে যা সুখময় মনে হবে, তা পরিণামে সুখদায়ক না হয়ে যন্ত্রণার কারণও হতে পারে। এজন্য মানুষকে বিবেচক হতে হবে এবং যথার্থ সুখের অন্বেষণ করতে হবে। তাকে কোনো কিছু উপভোগের ফলাফল চিন্তা করতে হবে। প্রজ্ঞা বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবেচনাই হচ্ছে মানুষের জীবনের হিতের মহৎ উপায়। মানসিক সুখ আর দৈহিক সুখ বলে সুখকে বিভক্ত করে দৈহিক সুখকে স্থূল আর মানসিক সুখকে বিমল ভাবার কোনো কারণ নেই। সব সুখের উৎস হচ্ছে দেহ। ক্ষুধার তৃপ্তিতেই সুখের শুরু। দেহের ক্ষুধা নিবৃত্ত না হলে মনের সুখ আদৌ আসতে পারে না। কিন্তু অবিমিশ্র মাত্রাতিরিক্ত দৈহিক সুখও যথার্থ সুখ নয়। কারণ অবিমিশ্র দৈহিক সুখ পরিণামে যন্ত্রণা ও ক্লেশের উদ্ভব ঘটায়। কাজেই দৈহিক সুখেরও পরিমাণ থাকতে হবে। বস্তুত পরিমিত এবং ভারসাম্য বজায় রাখাই হচ্ছে মানুষের সর্বাধিক কর্তব্য। জীবনের যে ক্ষুধা অপরিহার্য এবং স্বাভাবিক কেবল তাকে তৃপ্ত করাই হবে মানুষের পক্ষে সঙ্গত। চরম সুখ, চরম উপভোগ নয়। চরম সুখ হচ্ছে সমস্ত প্রকার অভাব ও ক্লেশমুক্ত অবস্থা। এপিক্যুরাসের এই সুখতত্ত্ব যে আদৌ নির্বিচার ইন্দ্রিয়ভোগের তত্ত্ব নয়, একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। বস্তুত এপিক্যুরাসের নীতি নির্দেশে যৌনভোগ পরিহার করার উপদেশেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন, এপিক্যুরাস তাঁর বস্তুবাদী দর্শন ও যুক্তিবাদী মন দিয়ে সুখকে জীবনের প্রধান কাম্য মনে করলেও তিনি পিরহোর বৈরাগ্যবাদ দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন আর তাই তাঁর নীতি-দর্শনে তিনি মানুষকে জীবনের প্রয়োজন বৃদ্ধি করার বদলে সীমিত করার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর অনুসারীদের তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণায় নিয়ত হতে এবং তার মধ্যে জীবনের শান্তি লাভের আহ্বান জানিয়েছেন। এপিক্যুরাসের নীতিবাদ কোনো সামাজিক তত্ত্ব নয়। এ তত্ত্ব ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

সুখবাদ বা নীতি-তত্ত্ব এপিক্যুরাসের দর্শনের কেন্দ্র হলেও তাঁর মনের জিজ্ঞাসা ছিল বিচিত্রমুখী। সত্যের মাপকাঠি কী, বস্তুর মূলসত্তা কী, আত্মা কীভাবে গঠিত, ইত্যাদি বিষয়েও তাঁর মতামত সুস্পষ্ট ছিল। মানুষ দৃশ্য থেকে অদৃশ্য সম্পর্কে অনুমান করে। মানুষের কাছে দৃশ্য এবং প্রত্যক্ষ হচ্ছে তার ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা। ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রত্যক্ষ বলে ইন্দ্রিয়ানুভূতি হচ্ছে মানুষের জ্ঞানের যথার্থতা বা সত্যের পরিমাপক। মন হচ্ছে ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতির সংগ্রহশালা। এই সংগ্রহশালা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে মন বিশ্লেষণ, পরিমাপ, তুলনা, অনুমান ইত্যাদির ক্ষমতা অর্জন করে। বস্তুর সার বা মূলের প্রশ্নে ডিমোক্রিটাস (৪৬০-৩৭০ খ্রি. পূ.)-এর ন্যায় এপিক্যুরাসও অনুতত্ত্বের অভিমত প্রকাশ করেন। এপিক্যুরাসও মনে করতেন যে, বস্তুর মূলে আছে অচিন্তনীয়রূপে সূক্ষ্মাকারের অবিভাজ্য সংখ্যাহীন অণু। অণু পরিবর্তনীয় এবং দুর্ভেদ্য। অসীম শূন্যে ঘূর্ণমান অণুর আকস্মিক সংযোগ এবং বিয়োগে সংখ্যাহীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচিত্র সৃষ্টির নিয়ত উদ্ভব এবং ধ্বংস সাধিত হয়। এপিক্যুরাস ছিলেন নিরীশ্বরবাদী। তিনি বলতেন, মানুষকে ভূত, ভগবান এবং পরকালের ভীতি থেকে মুক্ত করতে পারলেই তাঁর মধ্যে সত্যিকার সৎচরিত্রের সৃষ্টি সম্ভব হবে এবং মানুষ পরম শান্তি লাভ করতে সক্ষম হবে। ডিমোক্রিটাসের ব্যাখ্যাত মনোবিদ্যারও বিকাশ ঘটে এপিক্যুরাসের হাতে। তিনি মানুষের মন বা আত্মাকে দুভাগে বিভক্ত বলে মনে করেন। এক ভাগ হচ্ছে তার যুক্তির ভাগ। এ ভাগের অবস্থান মানুষের হৃদয়ে। মানুষের এ অংশে বিচিত্র প্রকারের জটিল গতিতে সংযোজিত হয়ে মানুষের চিন্তা, ইচ্ছা, আবেগ প্রভৃতি বোধের সৃষ্টি করে। মনের অপর ভাগ হচ্ছে স্থূল বা অযুক্তির ভাগ। দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে এ ভাগের গঠন এবং এর অণুগুলি ততো দৃঢ় সংযোজনে আবদ্ধ নয়। কিন্তু মানুষের এই দুই অংশ নিয়েই তার সমগ্র কাঠামো গঠিত। মৃত্যুর পরে আত্মা অণুগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মার বিলোপ ঘটায়। কাজেই মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয়। দর্শনের ইতিহাসে এপিক্যুরাসের নাম সঙ্গতিপূর্ণ বস্তুবাদী দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম হিসাবে প্রখ্যাত হয়ে আছে।

AMARBOI.COM

দুই

আধুনিক গ্রিস আমাদের মনে কোনো বিস্ময়ের সঞ্চার করে না। কোনো কৌতূহলের সৃষ্টি করে না। কিন্তু আড়াই হাজার বছর আগের গ্রিস সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল এবং বিস্ময়ের শেষ নেই।

মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের ইতিহাসে এটিও একটি বড় প্রশ্ন। কোন সময়ে কোন দেশ এবং কোন মানুষ কী অবদান রাখবে তার নিশ্চয়তা কী? এবং জাতীয় ঐতিহ্যেরও যদি প্রশ্ন ওঠে তবু কোনো জাতির অতীত ঐতিহ্য থাকলেই যে তার বর্তমান মানুষ সে ঐতিহ্যের ধারক এবং গ্রাহকরূপে পরিগণিত হবে, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু আজকের দিনে বিশ্ব মানুষের জন্য যে অবস্থা আর ততো লোকসানের বিষয় নয়। জাতি তার জাতীয় ঐতিহ্যকে বিস্মৃত হতে পারে। কোনো জাতির বর্তমান তার অতীতকে স্বীকারও করতে পারে। কিন্তু কোনো জাতির কোনো মহৎ ঐতিহ্যই আজ আর কোনো জাতির সংকীর্ণ জাতীয় সম্পদ নয়। জাতীয় মহৎ ঐতিহ্য মাত্রই মানবজাতির ঐতিহ্যে পরিণত।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবহমান ধারার ক্ষেত্রে প্রাচীনকালের গ্রিস এবং তার পারিপার্শ্বিয় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মানুষের অবদান আজ বিশ্ব মানুষের মহৎ ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাচীন গ্রিসের জ্ঞান এবং দর্শনের ক্ষেত্রে প্লেটো এবং এ্যারিস্টটলের নাম সুবিদিত। তাঁদের চিন্তা এবং লেখনীর ক্ষমতা এবং প্রাচীনকালের সমাজে শাসক এবং অভিজাত শ্রেণীগত অবস্থান তাঁদের গ্রিক প্রজ্ঞার উত্তুঙ্গ চূড়া হিসেবে ইতিহাসে পরিচিত করেছে। কিন্তু এ কথা আজ কমবেশি পরিচিত যে, গ্রিসের ইতিহাসের শুরু প্লেটো এ্যারিস্টটল থেকে নয়।

প্লেটো এবং এ্যারিস্টটলের জীবনের কাল হচ্ছে যথাক্রমে খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭-৩৪৭ এবং ৩৮৪-৩২২ অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম এবং চতুর্থ শতক। ইতিহাসকারগণ বলেন, এ কাল হচ্ছে গ্রিসের নগর-রাষ্ট্রগুলির সামাজিক-রাজনীতিক ব্যবস্থার সঙ্কটকাল। নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রধান ছিল এথেন্স এবং স্পার্টা। নগর-রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল কৃষিকার্য, হস্তশিল্প, খনির ধাতব পদার্থ নিষ্কাশন এবং সামুদ্রিক বাণিজ্য। এ অর্থনীতির চালিকাশক্তি ছিল প্রধানত যুদ্ধবিগ্রহের বন্দি এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যপোতের ওপর আক্রমণ এবং লুণ্ঠনের মাধ্যমে সংগৃহীত দাসকুল। সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে প্রধান শ্রেণীগুলি ছিল ভূমি এবং পারিবারিক প্রাচীনতার অধিকারী অভিজাত শ্রেণী, কৃষি, কুটিরশিল্প এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত গ্রিকগণ এবং সকল প্রকার কঠিন দৈহিক শ্রমের ভার বহনকারী দাস। নগরীর অধিবাসীদের অধিক সংখ্যক ছিল দাস। এক সময়ে বৃহত্তর এথেন্স নগরীয় চার লক্ষ

অধিবাসীদের মধ্যে আড়াই লক্ষ ছিল দাস। রাজনীতিকভাবে রাষ্ট্রীয় শাসন ও ব্যবস্থাপনার সকল সুযোগ-সুবিধার অধিকারী ছিল 'নাগরিকগণ'। রাষ্ট্র তথা নগরীর অধিবাসী মাত্রই নাগরিক বলে গণ্য হতো না। দাসদের কোনো রাজনীতিক অধিকার ছিল না। দাসরা নাগরিক ছিল না। নগরীতে আগত বৈদেশিকদেরও কোনো নাগরিক অধিকার ছিল না। এমনকি প্রভু সমাজের শ্রমজীবী জনতা এবং ব্যবসায়ীদেরও গণ্য করা হতো না। সামগ্রিকভাবে দাসদের এবং প্রভুসমাজের শ্রমিকদেরও নাগরিক গণ্য করা উচিত নয়, এ্যারিস্টটল এরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর যুক্তি : দাসরা বুদ্ধির বিকাশের ক্ষেত্রে পুরো মানুষ নয়। যন্ত্রপাতি দু'রকমের হতে পারে, সজীব এবং অজীব। দাসরা সজীব যন্ত্র। শ্রমিকরাও একদিক দিয়ে দাস। শ্রমের দাস। তারা তাদের দৈহিক শ্রম দিয়ে জীবিকা অর্জন করে। জীবনের প্রতি মুহূর্তেই তাদের জীবিকার চিন্তায় উদ্ব্যস্ত থাকতে হয়। তাদের অবসর নেই রাষ্ট্রীয় শাসন সম্পর্কে চিন্তা করার। তাদের অবসর নেই রাষ্ট্র শাসনের গুণ এবং দক্ষতা অর্জন করার। কাজেই তাদেরও নাগরিক বলে গণ্য করা উচিত নয়। তাই শাসনের অধিকার থাকবে কেবলমাত্র অবসরভোগী শ্রেণীর। কার্যত অভিজাত শ্রেণীর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্লেটো এই অভিজাত শাসককুলেরই সন্তান ছিলেন। এ্যারিস্টটল ছিলেন প্লেটোর মানসপুত্র। তাঁর 'আদর্শ শাসক' তৈরির শিক্ষাগার একাডেমীর কৃতী শিষ্য। এথেন্স নগরীতে এ্যারিস্টটল ছিলেন বহিরাগত। এথেন্স তখন প্রাচীন গ্রিসের 'বিলেত' বিশেষ। প্রাচীন ইতিহাসের 'লন্ডন'। জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। এ্যারিস্টটল এসেছিলেন গ্রিস-উপদ্বীপের উত্তর-পূর্বীয় অঞ্চলের স্টাজিরা থেকে। ম্যাসিডনের কাছাকাছি ছিল স্টাজিরা। এথেন্সের নিকট ম্যাসিডন ছিল বৈদেশিক রাষ্ট্র। আর বহিরাগত বলেই এ্যারিস্টটলের দৃষ্টি এবং কৌতূহল ছিল প্লেটোর চেয়ে ব্যাপকতর, উদারতর এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দৃঢ়তর। তবু এ্যারিস্টটলও ছিলেন সমাজ-প্রভুদেরই শ্রেণীভুক্ত। তাই এ্যারিস্টটল এবং প্লেটোর জ্ঞানালোচনায় পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকলেও মৌলিক কোনো বিচ্ছেদ ছিল না। এ্যারিস্টটলের অধীনে শিক্ষার্থী হিসেবে এককালে ন্যস্ত কিশোর আলেকজান্ডার সম্রাট হয়ে 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' শুরু করেছিলেন। তিনি গ্রিসের সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ নগর-রাষ্টগুলির দেয়াল ভেঙে পৃথিবী জয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু গুরু এ্যারিস্টটল শিষ্যের পৃথিবী জয়ের যজ্ঞে শরিক হলেন না। তিনি ফিরে এসেছিলেন এথেন্স নগরীতে। এথেন্স তখন আলেকজান্ডারের পদানত। এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের অংশমাত্র। তার চল্লিশের দেয়াল ইতিহাসের অগ্রগতিকে আটকে রাখতে পারেনি। কিন্তু গ্রিক নগর-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনৈতিক অস্তিত্বের এই সঙ্কট এ্যারিস্টটলের রাজনৈতিক দৃষ্টিকে মৌলিকভাবে আলোড়িত করতে পারেনি। তাঁর মনোজগতে ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রই আদর্শ। তাঁর মনোজগতে নগর-রাষ্ট্রের দেয়াল তখনও অনড়। তাই তাঁর কাছে তখনও গ্রিকরাই সভ্য, অগ্রিকরা বর্বর। গ্রিকরাই শাসন করার উপযুক্ত। প্রভু হওয়ার উপযুক্ত। অগ্রিকগণ দাস হওয়ার উপযুক্ত। তাঁর বিচারে প্রকৃতি মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। এক ভাগকে প্রভু করে। অপর ভাগকে দাস করে। কারণ, প্রকৃতির সর্বত্রই শাসক এবং শাসিতের নীতি; প্রভু এবং দাসের নীতি পরিব্যাপ্ত। তাই প্রভুদের দেহ তুলতুলে নরম। হুকুম দেওয়ার জন্য উৎকৃষ্ট। দাসদের দেহ শক্ত, কঠিন। ভার বহনের উপযুক্ত।

রাষ্ট্র কি, সমাজ কি, মানুষে মানুষে সম্পর্কের মাপকাঠি কি এবং বস্তুর প্রকৃতি কি—জ্ঞানের মৌলিক প্রশ্নসমূহের ক্ষেত্রে প্লেটো-এ্যারিস্টটলেরও পূর্বসূরি ছিল। প্লেটো-এ্যারিস্টটলের নিকটও ইতিহাসের একটা ঐতিহ্য ছিল।

এই ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন আয়োনীয় দার্শনিকবৃন্দ। আয়োনীয় বলতে বোঝাত আদি গ্রিকদের সেই অংশকে, যারা প্রাচীন এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূল এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্ঞানের আদি প্রশ্ন ছিল : সত্য কি? সত্যের মূলে কি? চারদিকে এই অনিত্য বৈচিত্র্যের প্রকৃতি কি? এদের মূলের নিত্যসত্তা কি? সেই নিত্যসত্তাকে জানলেই আমরা বৈচিত্র্যের কারণ বুঝতে পারব। তাহলেই নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের সম্পর্ককে, বহুর সঙ্গে একের সম্পর্ককে নির্দিষ্ট করতে সক্ষম হব।

বিশ্বের রহস্যভেদের এই আদি জিজ্ঞাসায় আয়োনীয় দার্শনিকদের অন্বেষা এবং জবাবের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তাঁরা বস্তুজগতকেই সত্য বলে জেনেছিলেন। বস্তু বিচিত্র এবং তার বৈচিত্র্য সদা পরিবর্তমান। তাঁরা কোনো অ-বস্তু নিত্যকে কল্পনা করেননি। বস্তুর মধ্যেই বস্তুর বৈচিত্র্যের কারণ সন্ধান করেছেন। প্রাচীন গ্রিক ইতিহাসের এই আয়োনীয় চিন্তাই হচ্ছে গ্রিকদর্শন, আদি গ্রিকবিজ্ঞান। এর বস্তু এবং প্রকৃতি-নিষ্ঠার কারণেই এ বিশিষ্ট। কেবল গ্রিক কিংবা পাশ্চাত্য জগতের চিন্তার ক্ষেত্রেই নয়। সমগ্র পৃথিবীর প্রাচীন চিন্তার ক্ষেত্রেই আয়োনীয় দার্শনিকদের এই বস্তুবাদী চিন্তার তাৎপর্য অপরিসীম।

'প্রাথমিক গ্রিক চিন্তার বিশেষ মূল এখানে যে, এই চিন্তাবিদগণ জীবনের সকল প্রশ্নের সহজ এবং বাস্তব জবাবদানের চেষ্টা করেছেন। জগতের একটি দর্শন তাঁরা তৈরি করেছেন; জগতের বৈচিত্র্যের মূলে কি এবং কীভাবেই বা এই বৈচিত্র্যের সৃষ্টি, এর ব্যাখ্যা তাঁরা দিবার চেষ্টা করেছেন মানুষের বাস্তব জীবন এবং শ্রমের ভিত্তিতে, অলৌকিক কোনো শক্তির ভিত্তিতে নয়।'

এই আয়োনীয় চিন্তাবিদদের মধ্যেই আমরা সাক্ষাৎ পাই থেলিস, এ্যানাকসিমেনিস, এ্যানাকসিমেন্ডার, এ্যানাকসাগোরাস এবং এমপিডকলস-এর। এই ধারারই অন্যতম স্রষ্টা হচ্ছেন হিরাক্লিটাস এবং ডিমোক্রিটাস।

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম এবং ষষ্ঠ শতকের থেলিস বলেছিলেন, সমস্ত বৈচিত্র্যের মূলে রয়েছে পানি। পানি হচ্ছে মূল এবং নিত্যসত্তা। হিরাক্লিটাস (৫৩৫-৪৭৫) বলেছিলেন, পরিবর্তনে কোনো অনিত্যতা নেই। পরিবর্তনই মূল সত্য। পরিবর্তনই নিত্য সত্য এবং শাশ্বত সত্তা। ডিমোক্রিটাস (৪৬০-৩৭০) বলেছিলেন, সৃষ্টি এবং বৈচিত্র্যের মূল হচ্ছে অণু এবং মহাশূন্যতা। অসংখ্য মৌলিক অণু মহাশূন্যের মধ্যে নিরন্তর আবর্তিত হচ্ছে, অণুতে অণুতে সংযোগ সাধিত হয়। অণুতে অণুতে সংঘর্ষ এবং সংযোগের মাধ্যমে সৃষ্টি হচ্ছে সমস্ত রকম বস্তুপুঞ্জ। বস্তুর সৃষ্টির পেছনে আবর্তমান অণু ব্যতীত ঈশ্বর বা অণুর অতীত অপর কোনো সত্তা নেই এই তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য যেমন গভীর তেমনি এর সামাজিক-রাজনীতিক তাৎপর্যও কম নয়। বস্তুই যদি সত্য হয় এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অণুই যদি বস্তুর মূল হয় তাহলে কি পার্থক্য গ্রিক এবং অগ্রিকে? কি পার্থক্য দাস এবং প্রভুতে? এই প্রশ্নেরই সোজা জবাব দিতে শুরু করেছিলেন মুক্তবুদ্ধি সফিস্ট বা জ্ঞানী গরজিয়া, প্রেটোগোরাস প্রমুখ চিন্তাবিদ। প্রেটোগোরাস (৪৮৬-৪১৫) দ্বিধাহীনভাবেই বলেছিলেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। না, দেবতাও নয়। 'মানুষই সবকিছুর নিয়ামক।' এমনকি সত্যেরও।

ডিমোক্রিটাস কিংবা প্রেটোগোরাস– এরা কেউই প্লেটো এবং এ্যারিস্টটলের নিকট অপরিচিত ছিলেন না। প্লেটোর নিকট এরা প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। প্লেটোর নিকট এরা যে কেবল অপরিচিত ছিলেন না, তাই নয়। প্লেটো এদের এই দর্শনের তাৎপর্য অনুধাবনেও অক্ষম ছিলেন না। ডিমোক্রিটাস এবং প্রেটোগোরাসের দর্শনের অন্তর্নিহিত সত্য প্রচলিত গ্রিক সমাজব্যবস্থার অসঙ্গতির প্রতি ছিল সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জস্বরূপ। এ দর্শন ছিল সমস্ত সংকীর্ণতা এবং অসঙ্গতিকে অসার প্রতিপন্ন করে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ সমাজ এবং জ্ঞানের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার দর্শন। দাসের এবং শ্রমজীবীর শোষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ এবং তার মুখপাত্রগণ তাই এই দর্শনকে জেনেছিল তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে। প্লেটো এবং এ্যারিস্টটল ছিলেন অসঙ্গতিপূর্ণ সঙ্কট গ্রিক সমাজের ভাবগত মুখপাত্র। তাই প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক'-এ সফিস্ট চরিত্র দাঁড় করিয়ে তাদের সামাজিক রাজনৈতিক অভিমতকে খণ্ড করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ্যারিস্টটলও তাঁর 'পলিটিকস্'-এ যারা দাস ব্যবস্থাকে মানুষের তৈরি কৃত্রিম ব্যবস্থা বলে গণ্য করে তাদের যুক্তিকে ভিত্তিহীন বলে দাস ব্যবস্থাকে প্রকৃতিদত্ত বিধান বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

প্লেটোর ধীশক্তি অপরিসীম ছিল। কিন্তু প্লেটো বুঝতে পেরেছিলেন দাস এবং শ্রমজীবী মানুষের শোষণ, অসঙ্গতির যে প্রশ্নকে সমাজ জীবনে প্রকট করে তুলেছে তার জবাবে সফিস্টদের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপ যথেষ্ট নয়। তাঁর গুরু সক্রেটিসের মুখে কথা দিয়ে তিনি বলেছিলেন : অজ্ঞানতাতেই অন্যায়। কাজেই সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন জ্ঞানের এবং জ্ঞানীর। কিন্তু কি সে ন্যায়? সে ন্যায় দাস এবং প্রভুর সমান অধিকারে নয়। সে ন্যায় দাসের দাসত্বকে গ্রহণ করায়, শ্রমজীবীর শ্রমের ভার বহন করে চলায় এবং অবসরভোগীদের জ্ঞানীরূপ শাসক হওয়ায়। কিন্তু এ তত্ত্বও যুক্তি এবং জ্ঞানের বিষয় নয়। বিশ্বাসের বিষয়। এ তত্ত্বের শেকড় বাস্তব অভিজ্ঞতায় নয়। এ তত্ত্বের শেকড় সঙ্কটগ্রস্ত সুবিধাভোগী অভিজাত শ্রেণী আক্রান্ত সুবিধা এবং অবস্থাকে শোষিতের ওপর বিশ্বাস চাপিয়ে দিয়ে রক্ষা করার প্রয়াসের ভেতর। এ প্রয়াসের দর্শনগুরু প্লেটো খুব যে কৌশল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থাৎ যুক্তির গভীরতা প্রদর্শন করতে পেরেছেন এমনও নয়। ন্যায় মানে হচ্ছে দাসের দাস থাকা, শ্রমজীবীর শ্রমজীবী থাকা এবং শাসকের শাসক থাকা। কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে, এমন স্পষ্ট এবং স্থূল কথাটা কেবল দাস নয়, গ্রিক সমাজের প্রভুশ্রেণীর সাধারণ শ্রমজীবীও যদি মানতে না চায়?

প্লেটো বলেছেন : প্রয়োজন হলে মিথ্যার মাধ্যমে অবিশ্বাসীর মনে এই বিশ্বাসকে অনড় করার চেষ্টা করতে হবে। বলতে হবে : এটা ঈশ্বরের বিধান। বিধাতা কাউকে সৃষ্টি করেছেন স্বর্ণ বা সেরা ধাতু দিয়ে। কাউকে রৌপ্য দিয়ে। আর কাউকে নিকৃষ্ট লৌহ কিংবা তাম্র দিয়ে। তুমি শ্রমজীবী কিংবা দাস, কারণ তোমার মধ্যে নিকৃষ্ট ধাতুরই প্রাবল্য। এ বিধাতার বিধান।

প্রাক-প্লেটো যুগের দার্শনিকগণ প্লেটোর ন্যায় এতো কূটতার্কিক ছিলেন না। তাঁরা সরল ছিলেন। তাঁরা জীবনের সত্যের কাছাকাছি ছিলেন। তাই তাঁরা বলেছিলেন : দেবতা কোথায়? সবই তো পানি। সবই তো বস্তু।

প্লেটো বুঝলেন, মানুষের জন্য, বিশেষ করে সংখ্যাধিক সাধারণ শোষিত মানুষের জন্য, দাস এবং শ্রমজীবীর জন্য আগের চেয়েও সূক্ষ্ম দেবতার আবশ্যক। আবশ্যক পাতাল লোকের যন্ত্রণার ভয় এবং স্বর্ণলোকের সুখের মোহ। কারণ, সাধারণ মানুষ বিদ্রোহী হতে শুরু করেছে প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিরুদ্ধে। তাই 'রিপাবলিক'-এর দশম পুস্তকের অসংলগ্ন এবং আকস্মিক বোধ হলেও সচেতনভাবে তিনি পাতাল লোকে পাপীদের দণ্ডের এক লোমহর্ষক চিত্র অঙ্কন করলেন। আর তার ভূমিকায় বললেন : 'মৃত্যুর পরে ন্যায়বান এবং অন্যায়কারীর জন্য যে প্রাপ্য অপেক্ষা করে আছে তার তুলনায় তাদের ইহজগতের এই প্রাপ্য সংখ্যা এবং গুণের ক্ষেত্রে আদৌ তুলনীয় নয়।'

মোট কথা, প্লেটো এবং এ্যারিস্টটলেরও বিজ্ঞান, দর্শন এবং সমাজবোধের ক্ষেত্রে একটি সুস্থ, সহজ ঐতিহ্য ছিল। কিন্তু তাঁরা সে ঐতিহ্যকে পোষণ করেননি। তাঁরা সেই ঐতিহ্যের সামাজিক রাজনীতিক মানবিক ধর্মীয় তাৎপর্যকে সচেতনভাবে অস্বীকার করেছেন। মানুষকে তাঁরা সকল রকম ভয়বিমুক্ত সংগ্রামী সেনার পরিবর্তে দেবতার, পাতাল-লোকের এবং অজ্ঞাতিক রহস্যের অসহায় ক্রীড়নক করে রাখার চেষ্টা করেছেন। আর এ চেষ্টায় এ্যারিস্টটলের গুরু প্লেটো অবশ্যই গুরুর ভূমিকা পালন করেছেন। এবং পদ্ধতিতে পার্থক্য যাই থাক, শিষ্য এ্যারিস্টটলও গুরুর নাড়ির বন্ধন যে ছিন্ন করতে পারেননি সে সত্য তাঁর সামাজিক, নৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনাতে কারোর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক্ষেত্রেই আসে এপিক্যুরাসের কথা।

এপিক্যুরাসের জীবনকাল খ্রিস্টপূর্ব ৩৪১ কিংবা ৩৪০ থেকে ২৭০। অর্থাৎ এপিক্যুরাসের যখন জন্ম হলো প্লেটোর তখন মৃত্যু ঘটেছে প্রায় সাত বছর পূর্বে। কিন্তু এপিক্যুরাস বেঁচে ছিলেন এ্যারিস্টটলেরও পরে। এ্যারিস্টটলের মৃত্যু ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব ৩২২-এ। কাজেই এপিক্যুরাসের কাল মানে প্লেটো-এ্যারিস্টটলের উত্তরকাল। সম্রাট আলেকজান্ডারের পরবর্তীকালে সম্রাট আলেকজান্ডার ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত জয় করে দেশে ফেরার পথে মারা যান আকস্মিকভাবে খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ সালে। এ্যারিস্টটলের মৃত্যুর একবছর আগে। আলেকজান্ডার তৎকালীন পরিচিত পৃথিবীব্যাপী এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই 'অশ্বমেধ যজ্ঞে' যা তিনি জয় করেছিলেন তাকে সুদৃঢ় করতে পারেননি। তবু নানা জাতির তিনি সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। মানুষে মানুষে সাক্ষাৎ তিনি বৃদ্ধি করেছিলেন। সভ্যতার সঙ্গে সভ্যতার সংঘর্ষ এবং প্রত্যক্ষ সংযোগ তিনি ঘটিয়েছিলেন। মানুষের চিন্তা বিকাশে এ এক সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যময় ঘটনার সংঘটন। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত গ্রিক নগর-রাষ্ট্রের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দিক থেকে এ এক সঙ্কটের কাল। গ্রিক সমাজ এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। 'নাগরিকদের' প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কাল গত হয়েছে। নগর-রাষ্ট্রগুলির আপন আপন স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়েছে। রাষ্ট্রের সীমানা নগর-রাষ্ট্রের প্রাচীরকে অতিক্রম করে সাম্রাজ্যের আকার ধারণ করছে। কিন্তু সেখানে শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত নয়। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরে তাঁর সাম্রাজ্য দ্বন্দ্বমান সামরিক অধিনায়কদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বক্তির, এমনকি 'নাগরিকের' আর সেই পুরনো আত্মবিশ্বাস নেই। ব্যক্তি অসহায় বোধ করছে। 'নাগরিকও আজ আর শাসক নয়। শাসনে অংশগ্রহণের কোনো বিধান বা প্রথাগত প্রতিষ্ঠা নেই। শক্তির অর্থাৎ সামরিক শক্তির ভিত্তিতেই শাসক নির্দিষ্ট হচ্ছে। রাষ্ট্রের রাজধানীও খুব স্থির নয়। সামরিক শক্তির ভিত্তিতেই শাসকের ছাউনি এখন রাষ্ট্রের রাজধানী, মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের কেন্দ্র। ইতিহাসকারদের মতে, এ এক তীব্র সঙ্কটের কাল; অনিশ্চয়তা এবং অস্থিরতার কাল। সমস্ত ব্যক্তির মনে নিজের খোলসে এখন আবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা এখন জগত থেকে পশ্চাৎ অপসারণের কাল। কারণ এই পৃথিবী তো খারাপ। এর রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়ামক তো সকল ব্যক্তি নয়, সকল নাগরিক নয়। তাই কি হবে রাষ্ট্র নিয়ে মাথা ঘামিয়ে। ব্যক্তির আজ সুখ নয়, শক্তি নয়, শান্তির প্রশ্ন। মনের শান্তি। ব্যক্তির মনের মধ্যেই সেই শান্তির নিবাস। শান্তির জন্য মনের বাইরে অন্বেষণ বৃথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন অবস্থায় মানুষের মনে মৃত্যুর এবং ধর্মের অর্থাৎ মৃত্যু এবং দেবতার ভয় বৃদ্ধি পাবারই কথা। আর একালের অধিক সংখ্যক চিন্তাবিদ মানুষের এই অসহায়তা এবং ভয়কে পুঁজি করেই তাঁদের দর্শন তৈরি করেছেন। মানুষকে ভয় এবং অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে সংগ্রামী সৈনিকে পরিণত করতে চাননি। বাস্তবের অনিশ্চয়তা, রাষ্ট্রীয় শাসন শোষণ যন্ত্রণাকে প্রতিরোধহীনভাবে গ্রহণের দর্শন তাঁরা রচনা করেছেন। এই দর্শনেরই প্রধান পরিপোষক চিন্তাবিদগণ : সাইটিয়ামের জেনো থেকে দাস চিন্তাবিদ এপিকটেটাস এবং রোম সম্রাট মারকাস অরেলিয়াস পর্যন্ত। একদিক থেকে দেখলে স্টয়েকবাদীদের এই প্রতিরোধহীন আত্মসমর্পণের মধ্যেও প্রতিষ্ঠিত চিন্তার একটি প্রতিকূলতা পাওয়া যায়। বিশেষ করে এই চিন্তায় যে, মানুষে মানুষে অসাম্যের কোনো ভিত্তি নেই। এবং দেয়ালঘেরা নগর-রাষ্ট্রই রাষ্ট্র সংগঠনের শেষ নয়। মানুষ সংকীর্ণ নগর-রাষ্ট্রের নাগরিক নয়। সে বিশ্বরাষ্ট্রের নাগরিক। এরূপ চিন্তার মধ্যে প্লেটো-এ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রদর্শনকে অস্বীকারের চেষ্টা রয়েছে। এই ধারাতেই এপিক্যুরাস।

তবু এপিক্যুরাসের বৈশিষ্ট্য এখানে যে, এপিক্যুরাস সমাজে মানুষকে অসহায়তার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে সংগঠিত করার চেষ্টা না করলেও তার মনে এপিক্যুরাস সাহসের সঞ্চার করতে চেয়েছেন। তিনি মানুষের মনে ভয়ের সৃষ্টি করতে চাননি।

AMARBOI.COM

এপিক্যুরাসের জন্ম হয়েছিল এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলীয় দ্বীপ সামোসে। কিন্তু আঠার বছর বয়সে তিনি জ্ঞানচর্চার জন্য এথেন্সে আসেন। তারপর আবার দশ বছর কাটে তাঁর বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণে। এশিয়া মাইনরের একটি নগরে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে নাসিফেনসের সঙ্গে। নাসিফেনস ছিলেন অণুত্ত্বেরই আর এক প্রবক্তা। ত্রিশ যখন এপিক্যুরাসের বয়স তখন তিনি বসতি নেন মাইটেলেনে, এশিয়া মাইনরের উপকূলীয় দ্বীপ লেসবসের এক নগরীতে। মাইটেলেনেই এপিক্যুরাস তাঁর নিজের দর্শন প্রচার করতে শুরু করেন। বয়স যখন তাঁর চৌত্রিশ, তখন তিনি আবার ফিরে আসেন এথেন্স এবং এক বাগানবাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর দর্শন আশ্রম। তাঁর আশ্রমে তাঁর দার্শনিক অভিমত শ্রবণের জন্য সমবেত হয়েছিল যারা তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় দাস এবং মেয়েদের। মেয়েদের মধ্যে সমাজের পতিতাকেও তিনি তাঁর আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে দ্বিধা করেননি।

এপিক্যুরাসের একটি সাধারণ পরিচয় এরূপ যে, তিনি প্রাচীনকালের একজন সুখবাদী দার্শনিক। আর সুখ বলতেই আমাদের মনে আসে স্থূল সুখের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা, ভোগের কথা। এ কারণে এপিক্যুরাস 'সুখবাদী' ছিলেন কথার মধ্যে প্রকাশ পায় একটি নিন্দামূলক মনোভাব, প্রশংসা নয়। এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দার্শনিক সম্প্রদায় স্টয়েকবাদীদের সমালোচনায়। স্টয়েকবাদী এপিকটেটাস এপিক্যুরাসকে লক্ষ্য করে তীব্র কটাক্ষের ভাষায় বলেছিলেন : 'এই তোমার জীবন আর দর্শন যার জন্য তুমি গর্ববোধ কর! ভোজন, পান, রমণ এবং মলত্যাগ আর নিদ্রায় নাসিকা ধ্বনি?'

অথচ এপিক্যুরাস একজন সতেজ জীবনবাদী দার্শনিক ছিলেন। নিজের জীবনাচরণের তিনি ছিলেন বিস্ময়কররূপে সরল এবং মিতাচারী। শুধু নিজের জীবন নয়, তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়ের জন্যও ছিল জীবনাচরণের এই বিধি সাধারণ খাদ্য এবং পানীয় ছিল তাদের আহার। তাদের কৃচ্ছ্র বৈ বিলাসিতা কিংবা আধিক্য ছিল না কিছুর, একটি রুটির খণ্ড এবং পানি– এর অধিক কি প্রয়োজন? আরামের আধিক্যকে আমি ঘৃণা করি। আরাম তো ব্যারামের উৎস। আরাম থেকেই ব্যারামের উদ্ভব।'

কিন্তু এপিক্যুরাস সন্ন্যাসী ছিলেন না। সাধারণ মানুষের মনোভাবকে প্রকাশ করেই তিনি বলেছিলেন : সুখ কিংবা আনন্দ ছাড়া মানুষ আর কিসের জন্য জীবন ধারণ করে? উত্তমের যে প্রাপ্তি তা সুখের ওপরই স্থাপিত। প্রকৃতির বস্তুকে আমি দেখি। তাকে আমি স্পর্শ করি। আমার দেহে আনন্দের শিহরণ জাগে। মানুষকে আমি ভালোবাসি। ক্ষুধার বেদনাকে আমি খাদ্য গ্রহণে দূর করি। পেটের ক্ষুধাকে কেন্দ্র করেই সব আবর্তিত। কাজেই সুখ ব্যতীত মানুষের অনিষ্ট আর কি হতে পারে? কিন্তু স্থূলভোগে সুখ নেই। অতি ভোজনে আরাম নেই। অতি ভোজনেই ব্যারাম; পীড়া, বেদনা, যন্ত্রণা।

সুখ হচ্ছে বেদনা থেকে মুক্তি; বেদনার অভাব বা অনস্তিত্ব হচ্ছে সুখ। কাজেই মনন ব্যতিরেকে কেবল ভোগে যথার্থ সুখ মানুষ লাভ করতে পারে না। ভয় এবং বেদনা থেকে বিমুক্ত থাকাই মানুষের কাম্য।

'যারা অজ্ঞানতা এবং বিকার থেকে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে তারা ভ্রান্ত। আমরা যখন বলি, সুখ জীবনের লক্ষ্য তখন আমরা স্থূল ইন্দ্রিয়ভোগ কিংবা অনিয়ম এবং স্বেচ্ছাচারের সুখকে বুঝাইনে। যার প্রজ্ঞা নেই, তার সুখ নেই। প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই সুখ।'

দর্শন শুধু প্রকৃতির ব্যাখ্যা নয়। দর্শনের উদ্দেশ্য আছে। দর্শন হচ্ছে মানুষের দর্শন। মানুষ বাঁচতে চায়। বাঁচার জন্যই তাকে জিজ্ঞাসার মোকাবেলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে হয়। রহস্যের উদঘাটন করতে হয়। তাই এপিক্যুরাসের নিকট দর্শন কেবল প্রশ্নের যে কোনো জবাব নয়। 'যে দর্শন মানুষের মুক্তিকে সাহায্য করে না, সে দর্শন নিরর্থক।' আর মানুষের প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে ভয় থেকে মুক্তি। দেবতা এবং মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্তি। দেবতা আর মৃত্যুর ভয় মানুষের জীবনকে গ্রাস করে আছে। মৃত্যুর পরে আছে পাতালপুরীর ভয়ঙ্কর জীবন। দেবতারা সেখানে বিরাট মুগুর হাতে দণ্ডায়মান। সেখানে দাউ দাউ করে জ্বলছে নরকের অগ্নিকুণ্ড। দেবতাদের পাইক-বরকন্দাজ হেঁচড়ে-টেনে নেবে মৃত্যুর পরে আমাকে সেই অগ্নিকুণ্ডের দিকে আর ছুড়ে ফেলে দেবে সেই অগ্নিকুণ্ডে। কেননা প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এর দশম পুস্তকে মৃত এরের আত্মা পাতালপুরী দেখে আবার তার দেহে প্রবেশ করে জীবিত হয়ে পৃথিবীর মানুষকে শুনিয়েছে : 'আমরা নিজের চোখেই এ ভয়ানক দৃশ্য দেখেছি। আমরা তখন গুহার মুখে। সমস্ত অভিজ্ঞতা শেষ করে আমরা পুনরায় আরোহণের উদ্যোগ করেছি। এমন সময়ে আমরা দেখলাম আকস্মিকভাবে আরডিউস এবং তার সঙ্গে আরো একদল আত্মা এসে হাজির হলো। এরা সকলেই ছিল স্বৈরশাসক। তাছাড়া তাদের সঙ্গে এমন আত্মার দলও ছিল, যারা ব্যক্তিগতভাবে বৃহৎ দুষ্কর্মের নায়ক ছিল। তারাও গহ্বরের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারাও ভেবেছিল, তারা স্বর্গে আরোহণ করবে। কিন্তু আমরা দেখলাম, গহ্বরের মুখ তাদের গ্রহণ না করে আচম্বিতে গর্জন করে উঠল।

বস্তুত, এই দুরারোগ্য পাপীর দল কিংবা তাদের সঙ্গীদের মধ্যে যাদের দণ্ডভোগ সমাপ্ত হয়নি তাদের কেউ যখন গুহার মুখ দিয়ে উপরে আরোহণের চেষ্টা করছিল, তখনই গুহা গর্জন করে উঠেছিল। এবং সেসব ভীমাকার প্রহরী দণ্ডায়মান ছিল তারা সেই গর্জন ধ্বনি শ্রবণ করে অগ্রসর হয়ে তাদের ধরে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল। আরডিউস এবং তার সঙ্গীদের প্রহরীর দল হাত-পা বেঁধে নিচে ফেলে দিচ্ছিল, তাদের চাবুক মারছিল এবং রাস্তার ওপর দিয়ে তারা টেনে নিতে নিতে পথিকদের নিকট তাদের অপরাধের বর্ণনা দিচ্ছিল এবং বলছিল, এদের তারা নরকে নিক্ষেপ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। এবং অপরাধী ছাড়া অন্য যারা সেই গুহার মুখে দাঁড়িয়েছিল তাদের মনের সবচেয়ে বড় আতঙ্ক ছিল, পাছে তারাও গুহার সেই গর্জন ধ্বনি শুনতে পায়। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে গুহা যখন নীরব হয়ে রইল, তখন তারা একে একে অসীম আনন্দে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে'— আরডিউসের দর্শনকারীর এই বর্ণনা। এরা পৃথিবীর সমবেত মানুষকে বললো : এই হচ্ছে অন্যায়কারীর দণ্ড। আবার যারা ন্যায়বান তাদের পুরস্কারের পরিমাণও এর চেয়ে কম ছিল না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ কাহিনী কল্পনা। এ কাহিনী অলীক। প্লেটো নিজেই জানতেন, এ কাহিনী অলীক। প্লেটো কবির অধিক ছিলেন। তাঁর কল্পনার অধিকার এবং শক্তি ছিল। কিন্তু এ কাহিনী তৈরির উদ্দেশ্যটিকে খুব মহৎ বলা চলে না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যেন মানুষের মনে পরকালের ভয় বাসা বাঁধে। যেন পরকালের ভয়ে সে একালে অন্যায় কার্য না করে। কিন্তু ন্যায় কি? অন্যায় কি? শ্রেণী এবং স্বার্থ নিরপেক্ষতার কি কোনো মাপকাঠি আছে? সমগ্র রিপাবলিকে প্লেটো প্রয়াস পেয়েছেন তেমনি নিরপেক্ষ এক ন্যায়ের অস্তিত্বকে প্রমাণ করার। কিন্তু তাঁর সে নিরপেক্ষ ন্যায়ও যে প্রচলিত সমাজের প্রতিষ্ঠিত শক্তির স্বার্থই সাধন করে, এ সত্যকে তিনি যুক্তির ভস্ম দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে আবৃত করে রাখতে পারেননি।

বলা যায়, ন্যায়বানের জন্যও পুরস্কারের আশ্বাস আছে। কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের বিচার এতো সূক্ষ্ম যে, কি ভরসা আছে, আমরা সাধারণ মানুষেরা সেই বিচারে টিকে থাকব। তাই কোনো কেতাবই বলে না, সাধারণ মানুষের অধিকাংশ ন্যায়বান। পণ্ডিতরা বলেন, অসাধারণরাই ন্যায়বান হতে পারবে। তাদের বিচারে ন্যায়বান হয় খুব কম লোকই। পাপীরাই তো বেশি। আর বেশি তো সাধারণ মানুষ। তাই সাধারণ মানুষই পাপী। সাধারণত মানুষ তাই পাপের ভয়ে ভীত। অনিবার্য পাপ : তার জন্য আহরণের অর্থ নেই, তাই সে পাপী। সে অভিজাত নয়, তাই সে পাপী। দেবতারাও স্তব-আরতি-আরজু এবং পারিতোষিকে তুষ্ট হয়। সে উপাচার সরবরাহের ক্ষমতা দীন-দরিদ্র সাধারণের নেই। তাই সাধারণ মানুষ জীবনেও মৃত হয়ে আছে, মৃত্যুর পরে তার উপায় কি হবে, এ আতঙ্কে। এপিক্যুরাস বললেন, নিরর্থক সেই দার্শনিকের জীবন যে তার দর্শন দ্বারা সাধারণ মানুষকে এই মিথ্যা অলীক পরকালের ভয় থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল না।

এই পরকালের ভয়ের সঙ্গেই জড়িত মানুষের আত্মার অনিশ্চয়তার ভয়। দেহের মৃত্যু ঘটলেও আত্মার মৃত্যু ঘটে না। মৃত্যুর পরে আত্মা ঘুরে বেড়ায়। অশান্ত আত্মা শান্তি খুঁজে বেড়ায়। তাই আমরা মৃত্যুর পরে সুহৃদের জন্য কামনা করি, তার আত্মা শান্তি লাভ করুক। পরকালে আত্মার শান্তির দুশ্চিন্তা সাধারণ সরল মানুষের ইহকালের শান্তিকেও বিনষ্ট করে দেয়।

ভয় থেকে মুক্তিই হচ্ছে সুখ। দর্শনের কর্তব্য হচ্ছে মানুষর মনকে এই ভয় থেকে মুক্ত করা : ধর্মের ভয়, দেবতার ভয় আর মৃত্যুর ভয়।

এপিক্যুরাস এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁর দর্শন প্রচার করেছেন। দর্শনের ক্ষেত্রে প্লেটোর কূটবুদ্ধি-শক্তিশালী অভিজাত প্রধান দার্শনিকের প্রতিষ্ঠিত দর্শনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরুদ্ধে এ অবশ্যই বিদ্রোহ। আর এ দর্শনের তাৎপর্য হচ্ছে সাধারণের মনে সাহস সঞ্চারের তাৎপর্য। এ কারণে এ দর্শন সামাজিক রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত সমাজের কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অর্থেও অর্থবহ। এপিক্যুরাসের এ প্রয়াস হয়তো প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জয়লাভ করে মানুষের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি। প্রতিষ্ঠিত রয়েছে প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের দর্শন। প্রতিক্রিয়ার হাতে প্লেটোর দর্শন শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে সেই প্রাচীনকালেই। কিন্তু এ্যারিস্টটলের দর্শনেও বাস্তবতা এবং অভিজ্ঞতার যে উপকরণ ছিল মধ্যযুগের ইউরোপের প্রতিক্রিয়ার দুর্গ খ্রিস্টীয় যাজক প্রতিষ্ঠান তাকে সেই উপাদানমুক্ত করে ধর্মীয় গ্রন্থের অচলায়তনে পর্যবসিত করে মানুষের জাগতিক জ্ঞান এবং সামাজিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অগ্রগমনের বিরুদ্ধে অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যে-যুগে মানুষের মনে অসহায়তা এবং ভয় এবং অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক এবং যে সময়ে রাষ্ট্রীয় অরাজকতার কারণে মানুষ যথার্থই অধিকতর অসহায় বোধ করেছিল সে যুগেই এপিক্যুরাস মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন।

দেবতা এবং মৃত্যুর ভয় থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে যেয়ে এপিক্যুরাস বললেন : মানুষের এমন ভয় ভিত্তিহীন।

এপিক্যুরাস শুরু করলেন জ্ঞানের প্রশ্ন থেকে। তিনি বললেন : আমাদের জ্ঞানের মূল এবং নির্ভরযোগ্য উপায় হচ্ছে ইন্দ্রিয়। আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। অতীন্দ্রিয় উপায়ে জ্ঞানলাভের কোনো পন্থা নেই। এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের মূলে রয়েছে মানুষের বিশ্বাস যে, মানুষের মন বা আত্মার দেহাতীত একটা ভিন্ন অস্তিত্ব বিদ্যমান। তাই আমরা বলি, আমাদের আত্মা জানে, আমাদের মন জানে। আসলে ইন্দ্রিয়সমূহের বিশেষ বিন্যাসই মন এপিক্যুরাসের এই ব্যাখ্যারও ভিত্তি হচ্ছে বস্তুর উপাদান বা গঠনের ব্যাখ্যা। তিনি ডিমোক্রিটাসের বস্তুর অণুবাদী ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেছেন।

এপিক্যুরাস বললেন, ইন্দ্রিয় থেকে আমরা বস্তু এবং গতির জ্ঞান লাভ করি। বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে ইন্দ্রিয়ের নিকট থেকে বিস্তারিত জ্ঞান আমরা লাভ না করতে পারি। কিন্তু ইন্দ্রিয় যে জ্ঞান আমাদের দেয় তার সঙ্গে সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, অণু দিয়ে বস্তু গঠিত। অণু হচ্ছে বস্তুর ক্ষুদ্র কণা। তারা আকারে ক্ষুদ্র, অবিভাজ্য এবং নিরেট। তারা ওজন এবং গঠনে বিচিত্র। সংখ্যায় অসীম। সমগ্র বিশ্ব এবং বিশ্বাভ্যন্তরে বস্তুপুঞ্জ অণু দ্বারা গঠিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্ব যদি অণু দ্বারা গঠিত, তাহলে আমরা মানুষ, বিশ্বের অংশ হিসেবে, আমরাও অণু দ্বারা গঠিত। বস্তুর যেমন 'মৃত্যু' অর্থাৎ বিভাজন আছে, আমাদেরও তেমনি মৃত্যু আছে।

মৃত্যু মানে হচ্ছে সম্মিলিত অণুগুলির বিশ্লিষ্ট অবস্থায় ফিরে যাওয়া। কোনো বিশেষ সম্মেলন ভেঙে যাওয়া। কোনো বস্তু যেমন অণুর সম্মেলনে গঠিত, কোনো বস্তু আবার তেমনি অসম্মিলিত বিচ্ছিন্নতায় পর্যবসিত হতেও সক্ষম। কাজেই যে বস্তু তার উপাদানে বিভাজ্য সে বস্তু আকারগতভাবে স্থায়ী বা অমর নয়।

ব্যক্তির যখন মৃত্যু ঘটে তখন তার দেহ অণুপুঞ্জে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তার সম্মেলন ভেঙে যায়। কিন্তু মূল অণুর কোনো বিভাগ নেই এবং কোনো মৃত্যু নেই।

অণুপুঞ্জের এক সম্মেলনে যে বস্তুর সৃষ্টি, অণুপুঞ্জের ভিন্নতর সম্মেলনে ভিন্নতর বস্তুর সৃষ্টি।

মৃত্যুর পরে আত্মার অশান্তির ভয় অলীক। কারণ, আমাদের আত্মাও দেহের মতো অণু দ্বারা গঠিত। কাজেই দেহের যেমন বিভাজন আছে, মৃত্যু আছে, আত্মার অণু সম্মেলনেরও তেমনি বিভাজন এবং মৃত্যু আছে।

মৃত্যুর পরে আত্মার যখন কোনো অস্তিত্ব নেই, তখন পরকাল সম্পর্কে আমাদের চিন্তা এবং ভয়ের কোনো কারণ নেই।

আত্মার মৃত্যু আমাদের মনকে পরকালের দণ্ডের ভয় থেকে মুক্তি দেয়। ধর্ম আমাদের মনে পরকালের এই দণ্ডের ভয় সৃষ্টি করে। দেহের সঙ্গে আত্মার মৃত্যু ঘটে। তাই পরকালে দণ্ডভোগ অসম্ভব।'

মৃত্যুতে আমাদের কোনো লোকসান নেই। মৃত্যু জাগতিক ভোগের অবসান ঘটায়। কিন্তু মৃত্যুর পরে যখন প্রাপ্তির কোনো প্রশ্ন নেই তখন জাগতিক ভোগের অবসানকে লোকসান বলা যায় না। লোকসান তুলনামূলক কথা। যা পাওয়ার কথা তা না পেলেই লোকসান। যা পাওয়ার কথা নয়, তা না পাওয়াতে লোকসান ঘটতে পারে না।

জীবন এবং মৃত্যু পরস্পরবিরোধী। জীবন যখন আছে মৃত্যু তখন নেই। মৃত্যু যখন থাকে, জীবন তখন অস্তিত্বহীন। জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক নেই। জীবনের নিকট মৃত্যু অস্তিত্বহীন। কাজেই জীবনের পক্ষে মৃত্যুর চিন্তা অসার। অকারণ।

দেবতাদের সম্পর্কে ভয় নিরর্থক। দেবতারা আছেন বটে। কিন্তু তাঁদের সুখ ও শান্তির জগত পৃথক। দেবতাও অণুতে গঠিত। মহাশূন্যে তাঁদের বাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের জগত সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহ এবং মানুষের ভালোমন্দে তাঁদের অংশগ্রহণের কোনো কারণ নেই। তাঁদেরকে খুশি করারও কোনো প্রশ্ন নেই। আমাদের কোনো কার্যে তাদের ক্রোধান্বিত হওয়ার কোনো হেতু নেই।

আকাশ, চন্দ্র, সূর্য এবং তারকা এবং বজ্র ও বিদ্যুৎ– এরা দেবতার সৃষ্টি নয়। এরা প্রকৃতি। প্রাকৃতিকভাবে এদের সৃষ্টি। এ সৃষ্টির কোনো পূর্বনির্ধারিত অনড় নিয়ম নেই এবং আমরা কোনো অনিবার্য নিয়মের দাস নই।

শূন্যের মধ্যে অণুর গতি স্বাধীন। কোন অণু কোন অণুর সঙ্গে সম্মিলিত হবে এর কোনো পূর্বনির্ধারিত বিধান নেই। তাই অণুর গতি অনির্দিষ্ট। এ কারণেই আমাদের কার্যের স্বাধীনতা এবং বস্তুপুঞ্জের অভাবিতের অবকাশ।

দুঃখের অনুপস্থিতেই সুখ। কিন্তু দেহের সুখই কেবল সুখ নয়। আত্মার শান্তিও কাম্য। মনের শান্তির জন্য প্রয়োজন জীবনের জটিলতা পরিহার করা। রাজনীতি মানুষের মনে কোনো শান্তি আনতে পারে না। সে কেবল জটিলতা বৃদ্ধি করে। সন্তান-সন্ততিও অশান্তির কারণ। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির উত্তম সম্পর্ক হচ্ছে সখ্যের সম্পর্ক, হৃদ্যতার সম্পর্ক।

আর এ কথা যদি সত্য হয় যে, অসীম বিশ্বে অসংখ্য অণু প্রতি দিকে আবর্তিত হচ্ছে এবং বস্তুপুঞ্জের উদ্ভব ঘটাচ্ছে, তাহলে এ কথা ভাবারও আমাদের কোনো কারণ নেই যে, আমাদের এই পৃথিবী এবং আকাশই বিশ্বজগতের একমাত্র পৃথিবী এবং আকাশ। অন্যত্রও এমনি পৃথিবী, সমুদ্র, আকাশ এবং সজীব অস্তিত্বের কথা আমাদের অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। অণুর অসীম ভাণ্ডার কেবল আমাদের পৃথিবী এবং মানুষ সৃষ্টিতেই নিঃশেষ হয়ে গেছে, এমন কথা আমরা ভাবতে পারিনে। আমাদের ভাবতে হয়, অণুর যে সম্মেলনে আমাদের পরিচিত জীবন ও জগতের সৃষ্টি, তেমন সম্মেলনে অন্যত্রও সৃষ্ট হয়েছে বহু পৃথিবী এবং বহু জাতীয় মানব এবং বহু প্রকারের জন্তু।

আর এ কথাও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, বিশ্বজগত বা প্রকৃতির কোনো প্রভু নেই। প্রকৃতিই প্রকৃতির প্রভু। দেবতারা বিশ্বজগতের প্রভু নয়। কারণ কোনো দেবতারই ক্ষমতা নেই এই অসীম বিশ্বকে শাসন করার।

এপিক্যুরাস দর্শনের এরূপ বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় রোমান কবি লুক্রেশয়াসের 'প্রকৃতি বিষয়ক' দীর্ঘ কবিতার মধ্যে। ল্যাটিন কবিতা : 'ডা. বিরাম ন্যাচারা' (De rerum Natura) লুক্রেশয়াসের জীবনকাল হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব ৯৯ থেকে ৫৫। এপিক্যুরাসের নিজস্ব রচনাবলীর সংখ্যা কম ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গবেষকগণ বলেন, এপিক্যুরাসের নিজস্ব রচনাবলীর সংখ্যা কম ছিল না। গবেষকগণ বলেন, এপিক্যুরাসের রচনার সংখ্যা ছিল তিন শত। কিন্তু তার প্রায় সবই বিনষ্ট হয়ে গেছে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা তাঁর অভিমতের অনুকূল ছিল না। ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং কায়েমি স্বার্থ এবং তার পরিপোষক চিন্তাধারা এপিক্যুরাসকে অবজ্ঞা, অস্বীকার এবং অপপ্রচারের মাধ্যমে বিনাশ করতে চেয়েছে। হয়তো তাঁর অভিমত মানুষের নিকট একেবারেই অজ্ঞাত থেকে যেতো যদি তাঁর দর্শন দ্বারা প্রভাবিত কবি লুক্রেশয়াস তাঁর 'প্রকৃতি বিষয়ক' দীর্ঘ কবিতায় একান্ত আনুগত্যের সঙ্গে এপিক্যুরাসের দর্শনকে বিবৃত করার চেষ্ট না করতেন। এ কবিতাও প্রায় বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। ইউরোপে মধ্যযুগের শেষে যখন প্রাচীন গ্রিক ও রোমক ইতিহাস : তার সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, ভাস্কর্য পুনরুদ্ধারের প্রবাহ শুরু হয় তখন আবিষ্কৃত হলো লুক্রেশয়াসের এই কবিতা।

... ...

মানুষের অগ্রগতিকে যে সাহায্য করে সেই-ই মানুষের সুহৃদ। সেই-ই প্রগতিশীল। মানুষের অগ্রগতি ঘটে বস্তুজগতের সত্য উদ্ধারের ভিত্তিতে। বস্তু থেকেই সে উদ্ভূত। বস্তুর প্রকৃতি এবং নিয়মের সত্যোদ্ধারের মাধ্যমে বস্তুকে পরিবর্তন করার মধ্যেই তার শক্তির প্রকাশ এবং তার অগ্রগমন। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান তাই মানুষের সহায়ক। বিজ্ঞান মানুষের সুহৃদ। কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক সুহৃদ? কেবলমাত্র একজন পদার্থবিদ, কিংবা অঙ্কবিদ বা রসায়নবিদ? কিংবা সেও যে পদার্থবিদের সত্যকে জীবনের সার্বজনীন সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করাকে নিজের জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন? এবং এরূপ ব্রত যাঁর তিনি বৈজ্ঞানিক না অবৈজ্ঞানিক? প্লেটোর দর্শন বিজ্ঞানের সুস্থ বিকাশের প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে বলেই প্লেটো উত্তরকালের সমালোচনার পাত্র। এপিক্যুরাস মানুষকে দেবতা এবং পরকালের ভয়মুক্ত করে বস্তুর নিয়মের সত্যকে জীবন চালনার সত্য এবং দর্শন হিসেবে গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার ব্রত নিয়েছিলেন। কিন্তু এ ব্রত তিনি বস্তুর নিয়মকে সত্য জেনে গ্রহণ করেছিলেন কিংবা এ সত্য তাঁর জীবনাচরণ এবং নীতির পরিপোষক বলে তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

ইউরোপীয় এক পণ্ডিত বলেন, এপিক্যুরাস কুসংস্কার এবং অজ্ঞতাকে সুখের প্রতিবন্ধক বললেও তিনি ছিলেন বিজ্ঞানবিরোধী। অপর একজন বলেন, এপিক্যুরাস অণুতত্ত্ব গ্রহণ করেছিলেন এ কারণে নয় যে অণুতত্ত্ব সত্য। বরঞ্চ এ কারণে যে, মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব নেই, তাঁর এ বিশ্বাসকে অণুতত্ত্ব দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যায় বলেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পণ্ডিতদের এরূপ সিদ্ধান্ত কৌতুকজনক। কুসংস্কারের বিরুদ্ধতার মধ্যেই বিজ্ঞানের জন্ম। তাই যে মানুষ কুসংস্কারবিরোধী তাঁর দর্শন বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া কিংবা তিনি বিজ্ঞানবিরোধী—এরূপ কথায় পরস্পরবিরোধী উক্তির বিভ্রান্তিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বস্তুত এ অভিযোগ ভিত্তিহীন। কবি লুক্রেশিয়াসের কবিতায় এপিক্যুরাস-তত্ত্বের বিস্তারিত বর্ণনায় এবং এপিক্যুরাসের নীতিমালায় এবং মেনোসিসের নিকট লিখিত তাঁর পত্রে এপিক্যুরাসের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রয়েছে। ডিমোক্রিটাসের অনুতত্ত্ব এপিক্যুরাস গ্রহণ করেছিলেন সে তত্ত্ব তাঁর পছন্দসই বলে নয়। অণুতত্ত্বকে বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে সত্য অনুমান বলে মনে করেছিলেন বলেই।

এপিক্যুরাস দ্বিধাহীনভাবে বলেছেন : 'মনের অন্ধকার এবং ভীতিকে আমরা সূর্যের রশ্মি কিংবা দিনের আভায় দূর করতে পারিনে। তার জন্য প্রয়োজন আমাদের প্রকৃতির সত্তা এবং তার কার্যকারণের জ্ঞান। আর অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীকরণে আমাদের সূচনা হবে এই প্রত্যয়ে যে, কোনো ঈশ্বরই অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব সৃষ্টি করতে পারে না।'

এপিক্যুরাসের দর্শন তাই কেবল যে প্লেটোর ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাই নয়। এপিক্যুরাস চেষ্টা করেছেন প্লেটো-এ্যারিস্টটলপূর্ব যুগের আয়োনীয় বস্তুবাদী দর্শনের ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করতে। মানুষের জীবনকে একটি বৈজ্ঞানিক বোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছেন এপিক্যুরাস। আর এই প্রচেষ্টায় তিনি আদি পথিকৃৎ। বস্তুত প্রতিষ্ঠিত আর কোনো দর্শন বা তত্ত্ব যে কাজ সাধন করতে সাহস পায়নি এপিক্যুরাসের দর্শন তাই সাধন করেছে। এপিক্যুরীয়বাদের অসম্পূর্ণতা এবং দুর্বলতা যাই থাক না কেন, এপিক্যুরাসের দর্শনই প্রকৃতির রাজ্য থেকে অতি প্রাকৃতিককে হটিয়ে দেবার সাহস দেখিয়েছে।

'জগতের ব্যাখ্যা থেকে দেবতাদের বহিষ্কার করে এপিক্যুরাস মানুষ এতকাল যে অলীক কল্পকাহিনীর দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল এবং প্রতারিত হচ্ছিল সে কল্পকাহিনীর ভিতকেও এপিক্যুরাস বিনষ্ট করেছেন। এতোদিন যেখানে সমস্ত চিন্তাধারাতেই দেবতাদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড তুকতাক, মন্ত্র, তুষ্টি-অতুষ্টি, স্বপ্ন-মায়ার স্থান ছিল, প্লেটোর একাডেমি, এারিস্টটলের লাইস্যুম কিংবা অপর কোনো শিক্ষাগার, কোনোটিই যেখানে এই আধিদৈবিক বিশ্বাস থেকে মুক্ত ছিল না, এপিক্যুরাসই সেখানে প্রথম দার্শনিক যিনি এর সবকিছুকে অস্বীকার করার সাহস দেখিয়েছেন। সমাজের প্রতিষ্ঠিত ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা, ডাইনি এবং দেবতাদের বাহনের তিনি পরিহাসের পাত্র করে তুলেছিলেন। এবং আজো একথা বলা চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে, জ্ঞান এবং মুক্ত দৃষ্টির অর্থ যদি অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার থেকে মুক্তি হয়, তাহলে মুক্ত দৃষ্টির একমাত্র মানদণ্ড এপিক্যুরাস। এপিক্যুরাস যাকে ঘৃণা করেছেন এবং বর্জন করেছেন আজকের মানুষও যদি তাকেই ঘৃণা করতে পারে এবং বর্জন করতে পারে তবেই সে মুক্ত বুদ্ধির অধিকারী বলে দাবি করতে পারে।'

... ...

কবি লুক্রেশয়াস জীবনবাদী বস্তুবাদী এপিক্যুরাসকে উপযুক্তরূপেই মূল্যায়ন করেছিলেন। তিনি এপিক্যুরাসের দর্শন দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন :

তোমাকে আমি অনুসরণ করি
তুমিই সেই ব্যক্তি যে
ছিদ্রহীন অন্ধকারে জীবনের জন্য
উজ্জ্বল আলোর বর্তিকাকে তুলে ধরেছিলে।

কবি লুক্রেশয়াসের অমরকীর্তি এই যে তিনি এপিক্যুরাসকে নতুনভাবে মানুষের মহৎ ঐতিহ্যের উপাদানে পরিণত করে গেছেন। এপিক্যুরাসকে ইতিহাসের মধ্যে ধরে রেখেছেন। তাই তাঁর কবিতায় যে প্রশস্তি তিনি এপিক্যুরাসের প্রতি নিবেদন করেছেন তা আজো আমাদের মনে একটি সতেজ জীবনবোধের সৃষ্টি করে। কবি বলেছেন :

সেদিন যখন
ধরাপৃষ্ঠে মানুষের জীবন ছিল
ধর্মের নিষ্ঠুরতায় নিষ্পিষ্ট, পদদলিত।
যখন
ঊর্ধ্বদেশের স্বর্গ থেকে ভাগ্যদেবী
মরলোকের মানুষের দিকে তার মুখ ব্যাদান করছিল
সেদিন
গ্রিসের সেই একটি মানুষই
তার নির্ভয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল নিষ্ঠুরা সেই দেবীর মুখে
হ্যাঁ, একটি মানুষ।

সে মানুষ অস্বীকার করেছিল দেবতাকে। দেবীকে। তার সম্মুখে দাঁড়িয়েছিল সে নিষ্কম্প পদভরে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিষ্কম্প হৃদয়ে।

দেবতাদের কাহিনী,

বজ্রের নির্ঘোষ কিংবা ঊর্ধ্বলোকের দণ্ডের হুঙ্কার পারেনি তার উন্নত শিরকে আনত করতে, তার বিদ্রোহের অগ্নিকে নির্বাপিত করতে। বরঞ্চ সেই মানুষটির আত্মা সকল ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে

অমিত তেজের কৃপাণ হয়ে
ঝলসে উঠেছিল।
আর ঘোষণা করেছিল,
প্রকৃতির রহস্যের রুদ্ধদ্বারকে ভেঙে,
আলোকের অভিসারকে করার দুর্বার প্রতিজ্ঞা।
এবং
সে মানুষটির
সেই দুর্বার প্রতিজ্ঞা :
তার আত্মার অমিত তেজ জয়ী হল।
বিজয়ী সে আত্মা অগ্রসর হল
সম্মুখের দিকে।
সে অতিক্রম করে গেল
পৃথিবীর অগ্নিময় প্রাচীরকে
তার আত্মা
দিক দিগন্ত পরিভ্রমণ করল।
বারণহীন হল তার গতি
সীমাহীন বিশ্বে।
এবং সবশেষে

সেই মানুষটি : তার আত্মা : তার সাহস :
তার তেজ : তার প্রজ্ঞা
বিজয়ী হয়ে ফিরে এল আমাদের কাছে।
সে আমাদের দৃষ্টি দিল,
আমাদের সে জ্ঞান দিল
অস্তিত্বের রহস্যের।
আমরা জানলাম বস্তুর প্রকৃতি কি,
তার নীতি কি,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার অস্তিত্বের সীমা কি।
আর তাই আজ সেই দলিত, পিষ্ট—
মানুষের পায়ের নিচে,
সেই মানুষের পদতলে
যে মানুষকে সে দাস বানিয়েছিল একদিন,
সেই দেবতা, সেই ধর্ম।
স্বর্গ থেকে দেবতা আজ চ্যুত :
স্বর্গকে আজ দখল করেছে মানুষ :
সুউচ্চ স্বর্গ বিজয়ী মানুষ :
তার বিজয়দণ্ড আজ স্বর্গলোকে সমুদ্যত॥

... ...

সেই মানুষের কীর্তিকে
তুমি তুলনা করবে কার সঙ্গে।
দেবতাদের কীর্তির চেয়ে কি সে অধিক নয়?
কারণ, জীবনের মূলক সে আবিষ্কার করেছে—
আবিষ্কার করেছে তার প্রাচীনকে।
প্রাচীনদের অনেক কীর্তি আছে।
সিরিস আবিষ্কার করেছিল শস্যকে।
বাকাস আবিষ্কার করেছিল আঙুরের নির্যাসকে।
কিন্তু কি ক্ষতি হতো আমাদের
যদি আমরা না জানতাম দ্রাক্ষার নির্যাসকে?
কিন্তু সেই মানুষটি যদি আমাদের বক্ষ থেকে
নিষ্কাশিত না করত মৃত্যু এবং দেবতার ভীতিকে?
আমরা কেমন করে ধারণ করতাম আমাদের জীবনকে?
তুলনা করবে তাকে
বীর শ্রেষ্ঠ হারকিউলিসের সঙ্গে?
হারকিউলিস হত্যা করেছিল
নিমিয়ার ভয়ঙ্কর গর্জনকারী সিংহকে
এবং আরকেডিয়ার ভয়াল বন্য শূকরকে
এবং ক্রিটের হিংস্র বৃষকে
এবং লারনার বহু মস্তক-বিষধর সর্পকে।
কিন্তু কি ক্ষতি হতো আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি নিহত না হতো গর্জনকারী সেই সিংহ
এবং বন্য শূকর
অথবা বিষধর সর্প
কিংবা হিংস্র বৃষ?
কি ক্ষতি হতো আমাদের
যদি দূর স্পেনে এখনো বাস করতে থাকে
তিন পুরুষের শক্তি নিয়ে উপকথার গেরিয়ন?
কিংবা বলকান উপত্যকায়, থ্রেসের ডায়োমিডের
নাসারন্ধ্রে অগ্নিবর্ষী অশ্ব?
কি ক্ষতি হতো আমাদের
যদি ভয়ঙ্কর সেই আঁশমণ্ডিত ভয়াল দৃষ্টির সর্প
হেসপিরাইডিসের স্বর্ণ আপেলকে
আগলে রাখে আজো
এবং মানুষ যদি না যেতে পারে
আটলান্টিক সমুদ্রের তীরভূমিতে?
আমি বলব,
কোনো ক্ষতি হতো না মানুষের
যদি উপকথার সেই ভয়াল জীবগুলো
ধ্বংস না হতো।
আজো পৃথিবীতে বিচরণ করছে
কতো হিংস্র পশু
ঝোপের আড়ালে
পর্বতের পাদদেশে
এবং গভীর অরণ্যে।
কিন্তু কেমন করে ধারণ করতাম আমরা, আমাদের জীবনকে
যদি সেই মানুষটি
আমাদের বক্ষ থেকে নিষ্কাশিত না করত
মৃত্যু এবং দেবতার ভীতিকে?
আমরা শিকার হতাম
সহস্র বাসনার
অহঙ্কার এবং হীনতা
লালসা এবং আত্মরতি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৩

এবং পৌনঃপুনিকতার ক্লান্তি
আমাদের জীবনকে
শত আঘাতে বিদীর্ণ করত।
কিন্তু সেই মানুষটি
মুক্ত করেছে মানুষকে
এই হিংস্র প্রকৃতির আঘাত থেকে।
কোনো শাণিত কৃপাণ দিয়ে নয়,
প্রজ্ঞার শক্তিতে।
আর তাই
আসন যদি উচ্চ হয় দেবতার
উচ্চ হবে মানুষের মুক্তিদাতা এই মানুষটি আসন
দেবতাদের সেই সুউচ্চ সারিতে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সক্রেটিস

সক্রেটিস (৪৬৯-৩৯৯ খ্রি.পূ.) ছিলেন প্রাচীন গ্রিসের দার্শনিক। এথেন্স নগর-রাষ্ট্রের নাগরিক ছিলেন তিনি। তিনি নিজে কিছু রচনা করেননি। তাঁর দর্শন এবং জীবনকাহিনী জানা যায় তাঁর প্রখ্যাত শিষ্য প্লেটোর রচনাবলী থেকে। প্লেটো সংলাপের আকারে তাঁর সমস্ত দার্শনিক পুস্তক রচনা করেন। প্লেটোর সকল গ্রন্থেরই নায়ক হচ্ছেন সক্রেটিস। সক্রেটিস পথে-ঘাটে-বাজারে সর্বদা তত্ত্বকথার আলোচনা করতেন। প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, কোনোকিছুকেই তিনি বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করতেন না। তিনি ছিলেন জ্ঞানের অন্বেষক। তাঁর চরিত্রের সরলতা এবং জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা তাঁকে এথেন্সের তরুণদের নিকট প্রিয় করে তোলে। তাঁর জনপ্রিয়তা, প্রচলিত ধর্ম এবং রাষ্ট্রীয় নীতি সম্পর্কে তরুণের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করার প্রবণতায় আতঙ্কিত হয়ে এথেন্সের সরকার তাঁকে তরুণদের বিপথগামী করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। সক্রেটিস ক্ষমা প্রার্থনা করে রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ সম্পর্কে আর প্রশ্ন তুলবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিলে তাঁকে মুক্তি দেয়া হবে; অন্যথায় তাঁকে হেমলক পান করে মৃত্যুবরণ করতে হবে– এথেন্স নগরের আদালত এই দণ্ড ঘোষণা করে। তাঁর শিষ্যগণ তাঁকে গোপনে কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়ার উপদেশ দেন। কিন্তু সক্রেটিস ক্ষমা প্রার্থনা কিংবা গোপনে পলায়ন করে জীবন রক্ষা কোনোটাকেই গ্রহণ করলেন না। তিনি একদিকে তাঁর বিচারকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন, তাঁকে বিচার করার কোনো অধিকার তাদের নেই। কিন্তু রাষ্ট্রের বিচারালয় হিসেবে তাদের দণ্ডাজ্ঞা তিনি গ্রহণ করে হেমলক পান করে অকম্পিতচিত্তে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জীবনের এ উপাখ্যান প্লেটোর গ্রন্থসমূহ থেকে পাওয়া যায়। তাঁর জীবনত্যাগের এ কাহিনী তাঁকে পৃথিবীর ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। সক্রেটিসের নিজস্ব কোনো রচনা না থাকায় এবং প্লেটো কোথাও তাঁর রচনায় সক্রেটিসের কোনো মতকে খণ্ডন না করায় সক্রেটিস এবং প্লেটোর দর্শনের মধ্যে কোনো পার্থক্য চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তবে প্লেটো অঙ্কিত সক্রেটিস চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা যায়, সক্রেটিস ছিলেন জ্ঞান-প্রেমিক। তাঁর মতে, জ্ঞান হচ্ছে আসলে জিজ্ঞাসা এবং অন্বেষা। তিনি বলতেন, আমরা সবাই নিশ্চিন্তে সব সময় বলি, আমরা সবকিছু জানি। আসলে আমরা কতোটুকু জানি? সক্রেটিসকে সকলে সবচেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্ঞানী বলতেন। এ খ্যাতির বিশ্লেষণে তিনি পরিহাস করে বলেছিলেন : আমাকে কেন লোকে জ্ঞানী বলে, আমি কতোটুকু জানি, এ প্রশ্নের রহস্যভেদ করার জন্য আমি কতো মানুষকে প্রশ্ন করেছি। নানা সমস্যা সম্পর্কে আমি তাদের প্রশ্ন করেছি। যাকে প্রশ্ন করেছি, সেই-ই অক্লেশে সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। দিনের পরিভ্রমণ শেষে ক্লান্তদেহে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি : এতোসব 'জ্ঞানীর' সঙ্গে আমার যদি কিছু পার্থক্য থাকে সে এই যে, আমি জানি যে আমি কিছু জানি না; কিন্তু এরা জানে না যে এরা কিছু জানে না। সক্রেটিসের এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝা যায়, তিনি মানুষের জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ মনে করতেন। বিশ্বের মূলসত্তা সম্পর্কে মানুষ জানতে পারে না। মানুষ কেবল সেই সত্তার সৃষ্ট-ভাবকেই জানতে পারে। ভাব মানুষের মনের ব্যাপার। মানুষের মনে বিশ্বের সেই অজ্ঞেয় সত্তা যে ভাবের সৃষ্টি করে, তার সঙ্গেই তার পরিচয়। জ্ঞান তাই মনের বাইরের কোনো বিষয় নয়। ব্যক্তির নিজের মধ্যেই জ্ঞান রয়েছে। শিক্ষকের কাজ হচ্ছে ধাত্রীর মতো ব্যক্তির মন থেকে সেই জ্ঞানশিশুকে বার করে এনে ব্যক্তিকে দেখানো যে, এ তার মধ্যেই ছিল। জ্ঞানের শিক্ষক এ ধাত্রীর কাজ সমাধা করবেন ব্যক্তির সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে। প্রশ্ন, জবাব এবং আবার প্রশ্ন, এ ধারায় ব্যক্তির জ্ঞানের মধ্যে যে অসঙ্গতি আছে, তা স্পষ্ট হবে। এবং অসঙ্গতি এবং মিথ্যাকে বাদ দিয়ে যা সত্য তা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। প্রশ্নোত্তরের এ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ছিল সক্রেটিসের জ্ঞান আলোচনার প্রধান পদ্ধতি। সক্রেটিস এবং প্লেটোর দর্শনচিন্তার সূক্ষ্মতায় এবং প্রকাশের প্রাঞ্জলতায় অত্যন্ত গভীর এবং আকর্ষণীয় ছিল। এ দর্শন প্রাচীন গ্রিসের দর্শনের বিকাশে একটি নতুন পর্যায়ের সূচনা করে। সক্রেটিসের পূর্বে গ্রিসের দর্শন ছিল প্রধানত বস্তুবাদী এবং প্রকৃতিবাদী। সক্রেটিস এবং প্লেটোর দর্শন মূলত ভাববাদী। সক্রেটিস এবং প্লেটোর কাছে ভাবই হচ্ছে সত্য। মানুষ ভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়। মানুষের মনের ভাব চরম ভাবের প্রকাশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্লেটো

প্লেটো (৪২৮/৪২৭-৩৪৭ খ্রি. পূ.) ছিলেন গ্রিসের ভাববাদী দার্শনিক। তিনি সক্রেটিসের শিষ্য ছিলেন। সক্রেটিসের নিজের কোনো রচনার কথা জানা যায় না। কিন্তু প্লেটো সক্রেটিসকে নায়ক করে বিপুলসংখ্যক সংলাপমূলক দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে রিপাবলিক লজ, এ্যাপোলজি, ক্রিটো, ফিডো, পারমিনাইডিস, থিটিটাস প্রভৃতি সংলাপের নাম বিশেষ বিখ্যাত। প্লেটোর পূর্ববর্তী গ্রিক দার্শনিকদের দর্শন ছিল প্রধানত প্রকৃতিবাদী। সে দর্শনে বস্তুর সত্যতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু প্লেটো তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে সমালোচনা করে ভাববাদী তত্ত্ব তৈরি করেন। তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে সমালোচনা করে ভাববাদী তত্ত্ব তৈরি করেন। তাঁর মতে দৃশ্য জগতের বস্তু সত্য নয়। দৃশ্য বস্তু হচ্ছে সেই ভাবের প্রকাশ। ভাব হচ্ছে অবিনশ্বর এবং অতীন্দ্রিয়। মূল সত্তা-রূপ ভাবের কোনো সৃষ্টি কিংবা ক্ষয় নেই। স্থান এবং সময়ের ওপরও সে নির্ভর করে না। এ ভাবকে প্লেটো আবার বিশ্বের আত্মা বলেও অভিহিত করেছেন। এই বিশ্ব-আত্মার খণ্ড প্রকাশ ঘটে ব্যক্তির আত্মার মধ্যে। আমাদের জ্ঞানের সঠিকতা নির্ভর করে ব্যক্তির আত্মার পক্ষে বিশ্ব-আত্মাকে আপন স্মৃতিতে ভাস্বর করে তোলার মধ্যে। জ্ঞানের মধ্যে প্লেটো একটা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির কথাও উল্লেখ করেছেন। এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির দুটি দিক। একদিকে আমরা ক্রমাধিক সাধারণীকরণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সাধারণ সত্যে আরোহণ করি। অপরদিকে সর্বোচ্চ সাধারণ সত্য থেকে ক্রমান্বয়ে অল্প থেকে অল্পতর সাধারণ সত্যের মাধ্যমে আমরা দৈনন্দিন বিশেষ সত্য বা ভাবে আরোহণ করি। গ্রিসের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল দাসের এবং অপরাপর শ্রমজীবী মানুষের শোষণ। প্লেটো নিজে ছিলেন অভিজাত শাসক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। 'লজ' বা বিধান এবং

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রিপাবলিক' নামক সংলাপে তিনি যে আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেছেন তার ভিত্তিও তাই দাসের শ্রম। রাষ্ট্রের শাসক হবে দার্শনিক সম্প্রদায়। তার রক্ষক হবে সৈন্যবাহিনী। দার্শনিক আর সামরিকবাহিনী এরাই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সত্তার অধিকার ভোগকারী স্বাধীন নাগরিক। এদের নিচে অবস্থান হচ্ছে দাস এবং শ্রমজীবী কারিগরের। তারা শ্রম করে শাসক দার্শনিক এবং রক্ষক সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন করবে। শাসক দার্শনিকদের জীবিকার জন্য কোনো চিন্তা করতে হবে না। তাদের কোনো ব্যক্তিগত পরিবার বা সম্পত্তি থাকবে না। কিন্তু তাই বলে তাদের কোনো কিছুর অভাবও থাকবে না। অভাবহীন অবকাশে তারা শাসনের কৌশল আয়ত্ত করবে এবং এইভাবে শাসন-বিশেষজ্ঞ হয়ে শাসনক্ষমতার একমাত্র অধিকারী হবে। শিশুকাল থেকে শাসক সম্প্রদায়ের সন্তানদের এক সার্বিক শিক্ষার মাধ্যমে শাসক হওয়ার উপযুক্ত গুণে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। প্লেটো যেভাবে রাষ্ট্রের শাসন, রক্ষণ এবং উৎপাদনমূলক কাজকে পৃথক করে এক এক সম্প্রদায়ের ওপর নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন তার মধ্যে শ্রম বিভাগের গুরুত্ব যে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্লেটোর শ্রমবিভাগ এবং আধুনিককালের শ্রমবিভাগ অবশ্যই পৃথক। প্লেটো তাঁর এই বিভাগকে কার্যত অনড় শ্রেণী বিভাগে যেমন পরিণত করেছিলেন, তেমনি এই বিভাগের একটিকে অপর একটি থেকে উত্তম এবং অধম বলেও নির্দিষ্ট করেছিলেন। শাসনের কাজ হচ্ছে সর্বোত্তম কাজ। আর শ্রম দিয়ে উৎপাদন রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় হলেও মূল্যায়নের দিক থেকে অধম কাজ। প্লেটোর ভাবগত দর্শন আর সমাজগত তত্ত্ব উভয়ই পরবর্তীকালের ভাববাদী চিন্তার বিকাশে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে।

এতদিনে 'প্লেটোর রিপাবলিক' একটি নিজস্ব অস্তিত্ব এবং পরিচয় লাভ করেছে। ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত 'প্লেটোর 'রিপাবলিকের' আন্তর্জাতিক অবয়বটি অনুসরণ করেই আমি এর বাংলা সংস্করণটি তৈরি করেছিলাম। সেই অবয়বটির কোনো পরিবর্তনকে আমি উচিত বলে মনে করিনি। মাওলা ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত বর্তমান প্রকাশোপলক্ষে নিজের মনের দিকে তাকিয়ে কেবল যে এই শতকের সবচাইতে প্রলয়ঙ্করী বন্যার অভিজ্ঞতাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে নিজেকেও প্রকৃতির শক্তির কাছে এক অসহায় প্রাণী বলে মনে হচ্ছে, তাই নয়। পৃথিবীর মানুষকে আজ প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্কের পারস্পরিকতা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃতি এবং মানুষ কি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রতিকূল শক্তি? সামগ্রিকভাবে স্বল্প দৃষ্টির মানুষ এতকাল এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এসেছে। এমন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই কথা তৈরি হয়েছে : 'প্রকৃতিকে জয় করতে হবে মানুষকে।' মানুষকে চেতনাসম্পন্ন প্রাণী বলা হয়। প্রকৃতিকে তেমন বলা হয় না। তথাপি বস্তুর সঙ্গে বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় যে অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং যুগে যুগে হয়েছে তাতে মানুষের পক্ষ থেকে প্রকৃতিকে সহমর্মিতার ভিত্তিতে না দেখে প্রতিদ্বন্দ্বীর ভিত্তিতে দেখা হয়েছে। এ আমার অনুভূতি। প্রকৃতির ওপর চেতনা এবং উদ্দেশ্য আরোপ না করেও ভাষার সীমাবদ্ধতার কারণে বলতে হয় : প্রকৃতি তারই অবুঝ সন্তান মনুষ্য নামক প্রাণীর ওপর অকরুণভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের মূর্তিতে যেন প্রকাশিত হচ্ছে। তার এক প্রকাশ থেকে আর এক ভয়াবহ প্রকাশের কাল-ব্যবধান যাই থাকুক না কেন, এবং প্রতিটি প্রকাশ যে পূর্ববর্তী প্রকাশের চাইতে ভয়ঙ্কর থেকে অতীব ভয়ঙ্কর হচ্ছে এবং হবে, আতঙ্কিত অবস্থায় আজ আমার তাই মনে হচ্ছে।

ভবিষ্যতের সেই ভয়ঙ্কর প্রকাশের দিনে অপর সাথীদের সঙ্গে আমিও থাকব না। তা নিশ্চিত। তবু মরণশীল হয়েও যে-মানুষকে অমর বলে আমি মনে করি, তার চিহ্নহীন বিলুপ্তির আশঙ্কা নিয়ে আমরা মরতে চাইনে। আমরা বিশ্বাস রাখতে চাই যে, আজকের অবুঝের মধ্যে কিছু বুঝমনেরও জন্ম ঘটবে। তারা তাদের সামাজিক-রাষ্ট্রীয়-বৈশ্বিক জীবনের সংকট ও সমস্যায় সক্রেটিস-প্লেটো-এ্যারিস্টটল-বুদ্ধ এবং অন্যসকল চিন্তাশীল প্রাজ্ঞের স্মরণে মনুষ্য সমাজের সমস্যা সম্পর্কে এঁদের চিন্তার পরিচয় দ্বারা হতাশার মধ্যেও জীবনের জয়ের আশা পোষণ করবে।

জীবন এবং মৃত্যু পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সম্পর্কিত। তবু মৃত্যুহীন আশাবাদী প্রাণী হিসাবে আমাদের এই প্রত্যয়টিকে ধারণ করতে হবে : জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে জীবনের জয় হয়। মৃত্যুর নয়। জীবনের নবজন্ম লাভ হয়। মৃত্যুর মৃত্যু ঘটে।

ব্যক্তিগত জীবনে হতাশার কথা দু'এক সময়ে প্রকাশ করলেও 'মানবজাতি' হিসাবে, বর্তমানের সব সংকট ও জটিলতা সত্ত্বেও মানুষ সম্পর্কে আমি আশাবাদী।

একটা তত্ত্ব : 'মানুষ' এক সময়ে এই প্রকৃতিজগতে বর্তমান আকারে অস্তিত্বময় ছিল না। তার পরে বস্তুজগতের কোটি কিংবা লক্ষ বছরের বিরামহীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের অস্তিত্বলাভ এবং সে অস্তিত্বের হাত, পা, মাথার অব্যাহত পরিবর্তন। এ নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক। আমি এ প্রবন্ধে তার আলোচনায় যাচ্ছিনে।

কিন্তু চিন্তার ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ যদি এসব তত্ত্বের 'হাঁ' এবং 'না' নিয়ে চিন্তা না করে, তা হলে তার আর 'মানুষ' নামধারণের কোনো অর্থ থাকে না। যে-সমাজে মনুষ্য সমাজ ও রাষ্ট্রের মানুষের ইতিহাসের পরিবর্তন প্রক্রিয়া নিয়ে যত অধিক তর্ক এবং বিতর্ক, সেই মনুষ্যসমাজ তত ঋদ্ধ, তত অধিক সে মনুষ্যসমাজ। মানুষ নানা রাষ্ট্রে বিভক্ত থাকে এবং থেকেছে। সেক্ষেত্রেও নিরন্তর পরিবর্তন। আজ রাষ্ট্রের এক সীমারেখা, তো কাল আর এক সীমারেখা।

প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে প্রাচীন গ্রিসের সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল: এই মহৎ মানুষেরা মানুষের মনে মানুষের নিজের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, তার সমাজ ও রাষ্ট্রগত সমস্যার নানা মৌলিক প্রশ্নের উদ্রেক করেছেন। সমাধানের কথাও হয়তো বলেছেন। কিন্তু সমাধানের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সমস্যার কথা জানা, সমস্যাকে অনুধাবন করা। কেবল যে গ্রিসের এই ধীমানরা আমাদের জীবনকে প্রশ্নময় করে তুলতে চেয়েছেন, তাই নয়। ভারত, চীন : প্রাচীন কালের সব সমাজের গুরু, ঋষি, ধীমানরা মানুষের জন্য এই কাজ করেছেন। মানুষের ইতিহাসের নানা পরিবর্তনের অন্যতম মূল কারণ মানুষের চিন্তা। সমস্যাকে চিহ্নিত করা। সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট হওয়া। হাজার হাজার বছরেরও পূর্বের, দেশ নির্বিশেষে মহৎ মানুষদের এই অবদানের জন্য বর্তমান কালের মানুষ হিসাবে আমরা তাঁদের কাছে ঋণ এবং কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ। এই ধারাতেই আরো মনীষীর আগমন। সে প্রক্রিয়া অব্যাহত।

'প্লেটোর রিপাবলিক' মানুষের জীবনের সমাজের ক্ষেত্রে একখানি চিরায়ত জীবনকোষ বিশেষ। মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলি দার্শনিক ও চিন্তাবিদ প্লেটো তাঁর অনবদ্য সংলাপের রীতিতে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তাঁর লিপিবদ্ধ সমস্যা প্রায় আড়াই হাজার বছর পরের বর্তমানের যে-পৃথিবী এবং তার অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহ : সেই পৃথিবী ও রাষ্ট্রসমূহের মানুষের জীবনেরও মৌলিক সমস্যা।

আমাদের সামাজিক-রাষ্ট্রীয় জীবনের নানা সমস্যার আমরা সমাধান অন্বেষণ করি। সমস্যার সমাধানের জন্য যে-প্রয়োজনটি সবার আগে আসে সে হচ্ছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞান। সমস্যার চরিত্র সম্পর্কে ধারণা। মানুষের সামাজিক জীবনের মৌলিক কোনো সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান আজও সাধিত হয়নি। সমস্যাহীন সামাজিক জীবন কল্পনা করা সম্ভব নয়। মানুষের জীবনে আদিকাল থেকে যা চলে এসেছে, তা তার জীবনের সমস্যার চরিত্র অনুধাবনের চেষ্টা এবং সমাধানের প্রয়াস। সমস্যা অনুধাবনের এ-চেষ্টা এবং সমাধানের প্রয়াস অনন্তকাল ধরেই চলবে। 'মানুষ' শব্দের অর্থই তাই : সমাধানে সচেষ্ট সমস্যাপূর্ণ এক জীবন।

মনুষ্যজীবনের এই অশেষ অভিযাত্রায় 'প্লেটোর রিপাবলিক' এক অনন্য সাথি এবং পথপ্রদর্শক।

'প্লেটোর রিপাবলিক' বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম এক চিরায়ত সৃষ্টি। চিরায়ত সৃষ্টির এই বৈশিষ্ট্য যে, তার মধ্যে মানুষের জীবনের মৌলিক সত্যগুলির যে-প্রকাশ ঘটে সেই সত্যগুলি কাল থেকে কালে মানুষের সংকটে এবং সমস্যায় মানুষের পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে। সে-কারণে বাংলাদেশের মানুষের জীবনে সাম্প্রতিক সময়ে ১৯৮৮ সালে মহাপ্লাবনের ন্যায় যে বন্যার আঘাত এসেছে এবং তার জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে, সে সংকটেও মানুষের সামাজিক রাষ্ট্রীয় জীবনযাপনের মৌলিক সমস্যার চিন্তায় 'প্লেটোর রিপাবলিক' আবার আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। এমন দুর্যোগের সময়ে জ্ঞানের সাধনায় যে-শিক্ষার্থীরা নিরত আছেন তাঁদের কাছে 'প্লেটোর রিপাবলিক'-এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

বেনজামিন ফ্যারিংটন যেরূপ সক্রেটিস-প্লেটো-পূর্বযুগের গ্রিক বিজ্ঞান ও দর্শনের বস্তুবাদী বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে তার পটভূমিতে প্লেটো-এ্যারিস্টটলের দর্শনের সামাজিক ভূমিকার নতুন ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা করেছেন সে দৃষ্টিভঙ্গিটি আমাদের দেশের শিক্ষা-আলোচনার ক্ষেত্রে আনা প্রয়োজন। 'রিপাবলিক'-এর ভূমিকায় তার কিছুটা আভাস দিলেও এ মূল্যায়ন অধিকতর বিস্তারিতভাবে করা আবশ্যক। ড. রওনক জাহান সংক্ষেপে বেশ সুন্দরভাবে অনুবাদের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে 'রিপাবলিক'-এর সংলাপমূলক পদ্ধতি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ যে বাঞ্ছনীয় তার কথাও বললেন। ড. মুহাম্মদ এনামুল হক তাঁর এই বৃদ্ধ বয়সেও আমার অনুবাদখানি পাওয়ামাত্র বিরতিহীনভাবে পাঠ করে শেষ করেছেন। তিনি বললেন, অনুবাদের সাবলীলতা দশম পুস্তকে এসে যেন একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিথিল হয়ে পড়েছে। তাঁর মন্তব্যটি খেয়াল রাখার বিষয়। এদিকে খেয়াল রেখে আমি আবার দশম পুস্তকখানা পাঠ করব। ড. মুজাফফর আহমদ চৌধুরী এরূপ কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন এবং এ্যারিস্টটলের 'পলিটিকস' গ্রন্থের অনুবাদেরও দাবি জানালেন।

যারা আলোচনা করেছেন তাঁরা উদার-হৃদয় বলেই দ্বিধাহীনভাবে অনুবাদককে উৎসাহদান করতে চেয়েছেন। আর সে উৎসাহদানের বিশেষ তাৎপর্য এই যে, প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এর ন্যায় চিরায়ত সাহিত্যের অনুবাদের প্রচেষ্টাকে আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষার বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁরা বিশেষ মূল্যবান বলে গণ্য করেন। বর্তমানে যে হতাশাজনক পরিস্থিতি সর্বত্র বিদ্যমান... তাতে যদি আমরা শিক্ষা ও সাহিত্যের কিছু মহৎ সৃষ্টি ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে তার কিছু পরিচয় সৃষ্টি করতে পারি, তবে সে সৃষ্টি নির্যাতিত মানুষের ভবিষ্যৎ সমাজের জন্য মহৎ ঐতিহ্যের সঞ্চয় হবে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক এবং আর্থিক জীবন অসহায় হলে মানসিক ক্ষেত্রেও যদি নিরন্ধ্র অন্ধকারকেই আমরা লালন করি তবে তা জীবনের চারপাশের আশাহীনতাকে অধিকতর অনিবার্য করে তুলবে। আজকের আলোচনার সার্থকতার এই একটি দিক নিশ্চয়ই আছে।

AMARBOI.COM

জ্ঞানান্বেষী ও সাহিত্যানুরাগী ছাত্রছাত্রী, শিক্ষাবিদ এবং পাঠকবৃন্দ যাঁরা সেদিন এই অনুবাদকর্মকে উৎসাহিত করেছিলেন তাঁদেরই আগ্রহে 'প্লেটোর রিপাবলিক'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ আজ সম্ভব হচ্ছে।

ইংরেজি ভাষায় 'রিপাবলিক'-এর একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক বেনজামিন জোয়েটের অনুবাদ ব্যতীত কর্নফোর্ড, এইচ.ডি.পি. লী এবং রিচার্ডস-এর অনুবাদও আমাদের নিকট পরিচিত। জোয়েটের অনুবাদের ভাষা-মাধুর্য সুবিদিত। সাম্প্রতিককালে অনেক অনুবাদক প্লেটোর ভাষার মাধুর্যের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ না করে 'রিপাবলিক'-এর বিষয়বস্তুর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাতে মানুষের দৈনন্দিন সংলাপ যেরূপ সাধারণ ভাষায় সংঘটিত হয়, এই ভাষ্যকারগণ তাঁদের অনুবাদে সেরূপ ভাষা ব্যবহার করার প্রয়াস পেয়েছেন। এর ফলে এ সমস্ত অনুবাদে সাহিত্য-স্বাদের অভাব অনুভূত হয়। অথচ প্লেটো পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। গবেষকগণ এ ক্ষেত্রে একমত যে, প্লেটোর ভাষাশৈলী ছিল বিস্ময়কর। তাঁর বিপুল সংলাপরাজি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যঞ্জনার দিক থেকে গদ্যকাব্যের ঝঙ্কারময় সৃষ্টি। প্রাচীন গ্রিক ভাষার সঙ্গে আমরা অপরিচিত। কিন্তু জোয়েটের অনুবাদের ভাষার মাধুর্য আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। অবশ্য বর্তমান অনুবাদে আমি কেবল যে জোয়েটের ওপর নির্ভর করেছি, এ কথা বলা যায় না। বাংলা ভাষায় প্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষার সাবলীলতার দিকে আমি যথাসাধ্য দৃষ্টি দিয়েছি। কিন্তু জোয়েটের অনুবাদ যদি কোথাও দুর্বোধ্য বোধ হয়েছে তবে সেক্ষেত্রে কর্নফোর্ড, লী এবং জোয়েট : সকলের ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করে সম্ভাব্য অর্থকে আমি গ্রহণ করেছি।

বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে 'রিপাবলিক' আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাহিত্য এবং সমাজতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যপুস্তক। আমাদের শিক্ষার মাধ্যম দ্রুত বাংলায় রূপান্তরিত হচ্ছে। বৈদেশিক কোনো ভাষা কোনো দেশেরই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চিরকাল বজায় থাকতে পারে না। ইংরেজির শিক্ষণ এবং চর্চা অধিকতর সুনির্দিষ্ট, লক্ষ্যসম্পন্ন, উন্নত এবং সুসংগঠিত হবে—এটাই আমরা আশা করি। কিন্তু বাংলা মাধ্যমের ঔচিত্যের কারণেই যে, 'রিপাবলিক'-এর মতো পুস্তকের বাংলা অনুবাদ আবশ্যক, তা নয়। বাস্তব কারণে আমাদের দেশে শিক্ষার মান যেমন বিনষ্ট হয়েছে, তেমনি ইংরেজি শিক্ষার মানের অধিকতর অবনয়ন ঘটেছে। ফলে, আমাদের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ডিগ্রি এবং ডিগ্রি-উত্তর পর্যায়ের ছাত্র-সাধারণের ইংরেজি পুস্তকসমূহ অনুধাবনের ক্ষমতা খুবই কম। শিক্ষার মান উন্নত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে মাতৃভাষায় জ্ঞানের ভাণ্ডারকে দ্রুত সমৃদ্ধ করে তোলা। রিপাবলিকের ন্যায় গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সঙ্গে আমাদের ছাত্র সমাজের পরিচয় শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু সে কাজ এ সমস্ত পুস্তকের উন্নতমানের অনুবাদের মাধ্যমেই মাত্র সম্ভব।

বাংলা সাহিত্যেরও ব্যাপার। আন্তর্জাতিকভাবে প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের উচ্চারণ এরূপ যে : সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যুর যে-কাহিনী দার্শনিক প্লেটো অতুলনীয়ভাবে মানুষের জন্য রেখে গেছেন, তার আভাস ও পরিচয় অন্তত অনুবাদের মাধ্যমে, যে ভাষা ও সাহিত্যে রক্ষিত নয়, সে ভাষা ও সাহিত্য সে-কারণে অধিকতর দরিদ্র। আমার সার্থকতা এবং আনন্দবোধ এই যে, আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্মের সর্বত্র, আমার শিক্ষকতার স্থানে যেটুকু সম্পর্ক তৈরির সৌভাগ্য ঘটেছে তার মাধ্যমে আমিও দেখেছি বুদ্ধি এবং বোধে দীপ্তিমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের ছাত্রছাত্রী এবং পাঠকবর্গ 'প্লেটোর সংলাপ' পাঠ করে আন্তরিক উদ্দীপনা বোধ করেছেন।

এতোদিন 'প্লেটোর সংলাপ' শিরোনামের 'সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যুর কাহিনী' আমাদের বাংলা সাহিত্যে একটি নিজস্ব অস্তিত্ব তৈরি করেছেন। আমাদের তরুণ নাট্যকারগণ নানা স্থানে এই মহৎ কাহিনীটিকে মঞ্চস্থ করে দর্শকবৃন্দকে উদ্দীপিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের সে চেষ্টার সংবাদ আমাকেও অনুপ্রাণিত করেছে।

আমাদের উত্তর প্রজন্মের হাতে মহৎ জীবনের মৃত্যুঞ্জয়ী বোধের বাহক হিসেবে 'প্লেটোর সংলাপ'-খানিকে তাদের হাতে আনন্দের সঙ্গে স্থাপন করে যাচ্ছি।

কোনো সাহিত্যকর্মকে ভাষান্তরিত করে হুবহু উপস্থিত করা যে কোনো ভাষা ও ভাষাবিদের পক্ষে দুরূহ। প্লেটোর সংলাপ বা 'ডায়ালগ'সমূহ শুধু দর্শন নয়, উচ্চাঙ্গ সাহিত্যকর্মেরও নিদর্শন। তথাপি প্লেটোর সঙ্গে আমাদের পরিচয় সাক্ষাৎ নয়, ইংরেজিকর্মেরই মাধ্যম। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংরেজ অধ্যাপক বেনজামিন জোয়েট প্লেটোর সমগ্র 'ডায়ালগ'কেই অনুবাদ করে ইংরেজি সাহিত্যে পেশ করেন। সে অনুবাদ উচ্চ সাহিত্যকর্ম হিসেবে আজ পর্যন্ত স্বীকৃতি পেয়ে আসছে।

অধ্যাপক জোয়েট মূল গ্রিককে অনুসরণ করলেও তিনি যে আক্ষরিক অনুবাদ করেননি একথা তাঁর বিভিন্ন পাদটীকা ও ব্যাখ্যাতে বোঝা যায়। তিনি মূল বিষয়ের অর্থ ইংরেজি ভাষায় প্রকাশের প্রাঞ্জলতার ওপর জোর দিয়েছিলেন। বর্তমান বাংলা অনুবাদেও আমি জোয়েট-কৃত অনুবাদের অর্থ এবং বাংলা প্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্যতার ওপর জোর দেবার চেষ্টা করেছি। সেই প্রয়োজনে জোয়েটের কোনো বাক্যকে ভেঙে পুনর্গঠিত করা হয়েছে। কিন্তু জোয়েটের অর্থকে পরিবর্তন করা হয়নি।

প্লেটোর দর্শনকে 'ডায়ালগের' আকারে বাঙালি সাহিত্যামোদী ও চিন্তাবিদদের দরবারে পেশ করার সুযোগ একটি মূল্যবান সুযোগ। বাংলা একাডেমী আমাকে সেই সুযোগদান করেছে। এজন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা বোধ করছি। এ অনুবাদকার্যকে আমি একটি মহৎকার্য হিসেবেই দেখেছি। আমার শক্তির সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এ মহৎকার্যে আমার আন্তরিকতার কোনো ত্রুটি ঘটেনি, এটুকু আমি বলতে পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'প্লেটোর সংলাপ'-এর প্রথম সংস্করণে প্লেটোর জীবন ও সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত আলোচনা থাকেনি। এটি একটি অসম্পূর্ণতার দিক। এক্ষেত্রে অনুবাদক এবং প্লেটোর রচনার পরিবেশনকারী হিসেবে আমার চিন্তা ছিল এরূপ যে, প্লেটোর রচনার প্রসাদগুণ এতো গভীর যে অনুবাদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ রচনা পাঠক সাধারণকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে। বস্তুত প্লেটোর রচনাকে আলোচনার মাধ্যমে আকর্ষণীয় করার প্রয়োজন পড়ে না। অবশ্য প্লেটোর দার্শনিক এবং রাষ্ট্রনীতিক চিন্তার আলোচনা আবশ্যক।

প্লেটোর যে ছ'টি সংলাপ এই সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে প্লেটো-দর্শনের সব দিক যে উপস্থিত, এমন নয়। বস্তুত এ ছ'টি সংলাপের এবং বিশেষ করে এর প্রথম তিনটি অর্থাৎ 'সক্রেটিসের জবানবন্দি', 'ক্রিটো' এবং 'ফিডো'র প্রধান গুণ তার মনোহারি ঐতিহাসিক নাটকীয়তা। এই তিনটি সংলাপে যথাক্রমে সক্রেটিসের বিচার এবং তাঁর জবানবন্দি, তাঁর ওপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ, কারাকক্ষে সক্রেটিসের দার্শনিক আলোচনা এবং হেমলক পানে তাঁর জীবনদানের বর্ণনা রয়েছে। এই তিনটি সংলাপে প্লেটো সক্রেটিসের মাধ্যমে নৈতিকতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা উত্থাপন করেছে। দার্শনিক প্রশ্নের দিক দিয়ে বর্তমান অনূদিত সংলাপই যে প্লেটোর একমাত্র কিংবা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রচনা, এমন নয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে একজন মহৎ ব্যক্তির ন্যায়-অন্যায় এবং আনুগত্য ও বিরোধিতার যে প্রশ্ন প্লেটো এই সংলাপ ক'টিতে তাঁর অতুলনীয় কাব্যময় গদ্যে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থিত করেছেন তা বিশ্বসাহিত্যে একটি অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। এমন সম্পদের সংযোজন ব্যতীত যে কোনো সাহিত্যই দরিদ্র থাকতে বাধ্য। এই চেতনা থেকেই প্লেটোর রচনার আভাসদানের প্রাথমিক পর্যায়ে এই ক'টি সংলাপকে সংকলনাকারে পেশ করেছিলাম।

যে কোনো চিন্তানায়কের দর্শন এবং চিন্তার সঠিক মূল্যায়নের জন্য আমাদের স্থান ও কালের একটি প্রেক্ষিত বোধ থাকা আবশ্যক। প্লেটোর সংলাপ যে রচনাশৈলীর গুণেই অমর হয়ে আছে তা নয়। প্লেটোর জীবনকাল খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭ থেকে ৩৫৭ সন পর্যন্ত বিস্তৃত। প্লেটোর শৈশব এবং কৈশোর কাটে স্পার্টার সঙ্গে এথেন্সের আত্মঘাতী পিলোপনেশীয় যুদ্ধের মধ্যে। এ যুদ্ধের মধ্যেই এথেন্স হৃতবল হয়ে পড়ে। তার পূর্বতন শৌর্য-বীর্য তখন ক্ষয়প্রাপ্ত। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নানা প্রশ্ন, সমস্যা এবং অস্থিরতা তখন আত্মপ্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে শুরু করেছে। অভিজাত বংশের সন্তান প্লেটো ছিলেন সক্রেটিসের শিষ্য। পিলোপনেশীয় যুদ্ধে এথেন্সের পরাজয়ের পরে খ্রিস্টপূর্ব ৩৯৯ সনে এথেন্সের শাসনব্যবস্থা সক্রেটিসকে নানা অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিচারে সোপর্দ করে। সক্রেটিসের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল, সক্রেটিস কূটতার্কিক। সক্রেটিস রাষ্ট্রের তরুণ সম্প্রদায়ের মনে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র এবং সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং অশ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি করে দিচ্ছেন। সক্রেটিস তরুণদের মনে ন্যায় কাকে বলে, অন্যায় কি, এরূপ মৌলিক প্রশ্ন জাগিয়ে তুলছেন। সক্রেটিস ভণ্ড জ্ঞানীর মুখোশ খুলে দিচ্ছেন। সক্রেটিসের নিজের ভাষায় : 'রাষ্ট্ররূপ মন্থরগতি অশ্বের জন্য আমি হচ্ছি বিধিদত্ত একটি ডাঁশ পোকা।' এই সমস্ত অভিযোগের বিচারে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সক্রেটিস স্বর্গমর্ত্যের কোনো সমস্যা নিয়ে আর আলোচনা করবেন না, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তুলবেন না, এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিচারকদের কাছ থেকে তিনি মুক্তিলাভ করতে পারতেন। এমনকি অনুসারীদের সহায়তায় কারাগার থেকে তিনি পলায়ন করতেও পারতেন। কিন্তু একদিকে যেমন নিজের বিবেককে মিথ্যার নিকট তিনি বিক্রয় করতে চাননি, তেমনি আবার রাষ্ট্রে অধর্ম এবং মিথ্যাচারী লোকদের করায়ত্ত হলেও রাষ্ট্রের নিয়মনীতি, শৃঙ্খলা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেও সক্রেটিস অস্বীকার করেছেন। অন্যায় আইনের তিনি প্রতিবাদ করেছেন, তার সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি 'আইন ভঙ্গকারী' হতে চাননি। এরূপ সিদ্ধান্তের মধ্যে সক্রেটিসের জীবনদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। সক্রেটিসের দর্শন সক্রেটিসের কোনো রচনায় পাওয়া যায় না। তাঁর নিজের কোনো রচনার কথা জানা যায় না। তিনি ঘরে বসে লেখার চেয়ে রাস্তার ধারে কিংবা বাজারে লোক জড়ো করে তাদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের পরিক্রমায় জীবন ও জগতের সমস্যার বিচার করাতে অধিক আনন্দ পেতেন এবং একেই সত্য লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা বলে বিবেচনা করতেন। কিন্তু প্লেটো সক্রেটিসকে নায়ক করে প্রশ্নোত্তরের দ্বান্দ্বিক রীতিতে বিপুলসংখ্যক দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে রিপাবলিক, লজ, অ্যাপোলজি বা জবানবন্দি, ক্রিটো, ফিডো, পারমিনাইডিস, সিম্পোজিয়াম, থিটিটাস, স্টেটসম্যান প্রভৃতি সংলাপের নাম বিশেষভাবে খ্যাত। প্লেটোর পূর্বগামী গ্রিক দার্শনিকদের দর্শন ছিল প্রধানত প্রকৃতিনির্ভর এবং বস্তুবাদী। সে দর্শনে বস্তুর সত্যতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু প্লেটো তাঁর পূর্বগামী দার্শনিকদের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে সমালোচনা করে জীবন ও জগতের ভাববাদী ব্যাখ্যা তৈরি করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রিসের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল দাস এবং অপরাপর শ্রমজীবী মানুষের শোষণ। এথেন্স নগররাষ্ট্রের অধিবাসীদের অর্ধাংশের অধিক ছিল দাস। অপর দেশের বাণিজ্য জাহাজ আক্রমণ এবং লুণ্ঠন করে এবং অপর নগর-রাষ্ট্র আক্রমণ করে তার অধিবাসীদের বন্দি করে দাস করা হতো। দাসদের কোনো নাগরিক অধিকার ছিল না। তাদের নাগরিক বলে গণ্য করা হতো না। প্লেটো ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁর 'লজ' বা বিধান এবং 'রিপাবলিক' নামক গ্রন্থে তিনি যে আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেছেন তার ভিত্তিও তাই নিম্নতর শ্রেণীর শ্রম। রাষ্ট্রের শাসক হবে যারা জ্ঞানী, যারা দার্শনিক। তার রক্ষক হবে সৈন্যবাহিনী। দার্শনিক এবং সৈন্যবাহিনী এরাই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সত্তার অধিকার ভোগকারী স্বাধীন নাগরিক। এদের নিচে অবস্থান হচ্ছে শ্রমজীবী কারিগরদের, উৎপাদকদের। তারা শ্রম করে শাসক-দার্শনিক এবং রাষ্ট্রের রক্ষক সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন করবে, তাদের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করবে। শাসক দার্শনিকদের কোনো ব্যক্তিগত পরিবার বা সম্পত্তি থাকবে না। কিন্তু তাই বলে তাদের কোনোকিছুর অভাব থাকবে না। অভাবহীন অবকাশে তারা শাসনের দক্ষতা আয়ত্ত করবে। কারণ 'শাসন' হচ্ছে অপরাপর কৌশলের ন্যায় একটি কৌশল। জুতা সেলাই একটি কৌশল বা শিল্প। তাকে শিক্ষা করে আয়ত্ত করতে হয়। যে সে কৌশল আয়ত্ত করেনি, সে জুতা সেলাই করতে অক্ষম। তাই সকলে জুতা সেলাই করতে পারে না। তেমনি যে রাষ্ট্রশাসনের শিল্পকে শিক্ষার মাধ্যমে আয়ত্ত না করেছে সে রাষ্ট্রশাসনে অক্ষম। রাষ্ট্রশাসনের ক্ষমতা তাই সকলের নয়! কেবল শাসনে দক্ষ যারা তাদের। দার্শনিকগণ রাষ্ট্রশাসনে সবচেয়ে দক্ষ। তারা সবচেয়ে জ্ঞানী। তারাই শাসনক্ষমতার একমাত্র যোগ্য অধিকারী। শিশুকাল থেকে রাষ্ট্র এক সার্বিক শিক্ষার মাধ্যমে শাসক হওয়ার উপযুক্ত নাগরিককে বাছাই করবে এবং পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা, বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সর্বোচ্চ দর্শন শিক্ষাদানের মাধ্যমে দার্শনিক-শাসক তৈরি করবে। প্লেটোর ভাববাদী দর্শন এবং রাষ্ট্রতত্ত্ব—উভয়ই পরবর্তীকালের চিন্তার বিকাশে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে।

প্লেটো রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে অভিজাততন্ত্রকে সমর্থন করেছেন। তৎকালীন এথেন্সের গণতন্ত্রকে তিনি বক্তৃতাবাগীশদের দ্বারা পরিচালিত আবেগপ্রবণ জনতার নীতিহীন ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্লেটোর রাষ্ট্রীয় তত্ত্ব গ্রহণীয় কিংবা বর্জনীয়—এটা আজ বড় কথা নয়। প্লেটোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর চিন্তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপুলতা। তাঁর রচনায় তৎকালীন গ্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সকল সমস্যার আলোচনাই স্থান লাভ করেছে। সেসব সমস্যার সমাধান সর্বকালীন নয়। এমনকি তাঁর নিজের জীবনকালেও তাঁর সব সমাধান গৃহীত বা প্রযোজ্য হয়নি। তাঁর আদর্শ দার্শনিক, শাসক হননি। কিংবা বাস্তবভাবে চেষ্টা করেও তিনি কোনো শাসককে আদর্শ দার্শনিকে রূপান্তরিত করতে পারেননি। কিন্তু এটা প্রধান নয়। প্রধান হচ্ছে মানুষের রাষ্ট্র এবং সমাজের মূল সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করতে পারা। প্লেটো তা পেরেছিলেন। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষের অধিকসংখ্যক সমস্যার মধ্যেই চিরন্তনতার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। মূলগতভাবে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে প্লেটো মানুষের যেসব সমস্যার উল্লেখ করেছেন আজকের মানুষেরও সেই সমস্যা। আজ নতুনতর সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ তার সমস্যা সমাধানের নতুনতর চেষ্টা চালাচ্ছে। এই প্রচেষ্টার পরিচয় আবশ্যক। প্লেটোর রচনার মধ্যে আমরা অতীতকালের এক সুবিকশিত নগর-রাষ্ট্রের সমস্যা ও তার সমাধান প্রচেষ্টার পরিচয় পাই। এদিক থেকে প্লেটোর রচনার মূল্য তার শিল্পগত সৌকর্যের বাইরেও আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে অপরিসীম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ্যারিস্টটল

এ্যারিস্টটলের (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.) আলোচনা প্রাচীন জ্ঞানের সর্বশাখায় বিস্তারিত ছিল। দর্শন, প্রকৃতিবিদ্যা, যুক্তিশাস্ত্র, জীববিদ্যা, মনোবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি এবং কাব্যরীতি—সর্বক্ষেত্রে এ্যারিস্টটলের অবদান রয়েছে। প্রাচীন জ্ঞানের ক্ষেত্রে এ্যারিস্টটল ছিলেন বিশ্বকোষিক। তখন গবেষণা এবং জ্ঞান সাধনার উপায়, অর্থাৎ কলা-কৌশল, যন্ত্রপাতি, দৈহিক যাতায়াত আজকের তুলনায় ছিল অনেক অপরিণত এবং সীমাবদ্ধ। সেদিক থেকে এ্যারিস্টটলের জ্ঞান ও গবেষণার আগ্রহ, উদ্যোগ এবং সাংগঠনিক ক্ষমতা আধুনিকের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে।

এ্যারিস্টটলের জীবনের বিস্তারিত পরিচয় না দিয়েও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যায়। এ্যারিস্টটল জন্মেছিলেন ম্যাসিডনিয়ার নিকটবর্তী স্টাগিরায় ৩৮৪ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে। তাঁর মৃত্যু ঘটে ৩২২ সনে। তাঁর পিতা ছিলেন ম্যাসিডনিয়ার রাজদরবারের একজন চিকিৎসক। চিকিৎসকের পারিবারিক পরিবেশে তাঁর শৈশব ও কৈশোরকালের অতিক্রমণ। প্লেটোর একাডেমীতে এসে তিনি যোগ দেন ১৭ বছর বয়সে, ৩৬৭ অব্দে। তারপর প্লেটোর মৃত্যু, অর্থাৎ ৩৪৭ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ বিশ বছর তিনি শিক্ষালাভ করেন প্লেটোর একাডেমীতে। প্লেটোর মৃত্যুর পর এথেন্স নগরী ত্যাগ করে তিনি যান এশিয়া মাইনরের নিকটবর্তী দ্বীপ লেসবসে। সেখানে তিনি গবেষণা করেন সামুদ্রিক জীবজন্তু নিয়ে। পরবর্তী পর্যায়ে রাজকুমার আলেকজান্ডারের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। কিন্তু যুবক আলেকজান্ডার সিংহাসনে আরোহণ করে দেশ বিজয়ে বার হলে এ্যারিস্টটল এথেন্স প্রত্যাবর্তন করে তাঁর নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লাইস্যুম প্রতিষ্ঠা করেন খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৫ সনে। প্লেটোর একাডেমীর সঙ্গে এ্যারিস্টটলের লাইস্যুমের চরিত্রে পার্থক্য ছিল। একাডেমীর জোর যেখানে ছিল প্রধানত দর্শন,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্য, কল্পনা এবং বিমূর্ত অঙ্কশাস্ত্রের ওপর, সেখানে লাইস্যুমের জোর ছিল বাস্তব গবেষণার ওপর। ইতিহাসকারগণ বলেন, এ্যারিস্টটল তাঁর শিষ্য আলেকজান্ডারকে অনুসরণ করে তাঁর দেশজয়ের সঙ্গী না হলেও উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। এ্যারিস্টটলের গবেষণাকার্যে আলেকজান্ডারের আর্থিক এবং রাজকীয় আনুকূল্য ছিল। সম্রাটের হুকুম ছিল যেন এ্যারিস্টটলের গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার লতা, পাতা, বৃক্ষ, জীবজন্তু সরবরাহ করা হয়।[২] এ কাজে গ্রিস এবং এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রায় সহস্র লোক নিযুক্ত ছিল। বস্তুত জ্ঞান ও গবেষণার সংগঠক এ্যারিস্টটল তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় সেই প্রাচীনকালে দস্তুরমতো একটি জীব-গবেষণাগার তৈরি করেছিলেন। এরূপও কাহিনী আছে যে, এ্যারিস্টটলের পরামর্শে আলেকজান্ডার নীলের বন্যার উৎস সন্ধানে একদল গবেষকের অভিযান সংগঠিত করেছিলেন। এ্যারিস্টটলের অভিজ্ঞতা এবং তথ্য সংগ্রহ কেবল প্রকৃতি বিজ্ঞানে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার পরিচয় লাভের জন্য এ্যারিস্টটল ১৫৮টি রাষ্ট্রের সংবিধান ও শাসনব্যবস্থার তথ্য সংগ্রহ করে সংবিধানের একটি গ্রন্থাগারও তাঁর লাইস্যুমে গড়ে তুলেছিলেন।

এথেন্স নগরীতে জীবনের অধিকাংশকাল অতিবাহিত করেও এ্যারিস্টটল যে এথেন্সের রাজনৈতিক জীবনকে একজন সমাজবিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণমূলক এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে পেরেছিলেন তার মূলে নিশ্চয়ই এ সত্যটি রয়েছে যে, এ্যারিস্টটল এথেন্সে জন্মগ্রহণ করেননি। এথেন্সে তিনি ছিলেন, বলা চলে, বহিরাগত এবং বৈদেশিক। এথেন্সের প্রচলিত নিয়মে এ্যারিস্টটল এথেন্সের নাগরিক হতে পারেননি। তিনি এথেন্সের শাসনপরিচালনায় কোনোভাবে যুক্ত হয়েছেন বলে জানা যায় না। শিক্ষার্থী হিসেবে তিনি প্লেটোর একাডেমীতে যোগ দিয়েছেন এবং শিক্ষক ও গবেষক হিসেবেই তাঁর সমগ্র জীবন তিনি অতিবাহিত করেছেন।

এ্যারিস্টটলের মৃত্যুর পরে দুহাজার তিনশ' বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। জ্ঞানের শাখা তখনকার চাইতে অধিকতরভাবে বিভিন্ন ও বিশিষ্ট হয়েছে। জীব, জীবন এবং মন—সর্বত্র নতুন নতুন সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। জ্ঞান ও গবেষণার নব নব উপায় এবং উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে। বিজ্ঞানের জগতে এ্যারিস্টটলের অনেক অনুমান আজ হয়তো ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত এবং পরিত্যক্ত হয়েছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সমাজ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমনটি আজো বলা যায় না। সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠন প্রাচীন গ্রিসীয় নগর-রাষ্ট্রের তুলনায় বৃহৎ এবং জটিল হয়েছে, এ কথা সত্য। দেশের সঙ্গে দেশের, মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, ঘনিষ্ঠ হয়েছে। গণনার কম্প্যুটার থেকে সাক্ষাৎ যোগাযোগের তার, বেতার, উপগ্রহ এবং দূর-চিত্রের উপকরণ আজ সর্বত্র মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী। তথাপি সমাজ-সমস্যার সমাধান যে খুব সহজতর হয়েছে এবং সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে এ্যারিস্টটলের অভিমতসমূহ সর্বক্ষেত্রে যে ভিত্তিহীন বা তাৎপর্যহীন হয়ে গেছে, এমন বলা যায় না। সেদিক থেকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ্যারিস্টটল আজ যতো না ক্রিয়াশীল, রাষ্ট্র এবং সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবশ্যই তার চাইতে অধিক পরিমাণে ক্রিয়াশীল।

সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এ্যারিস্টটলের শ্রেষ্ঠ রচনা নীতিশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রনীতি : 'এথিকস' এবং 'পলিটিকস'।

একে রচনা না বলে আলোচনা বলা উত্তম। গবেষকগণ মনে করেন, এ্যারিস্টটলের প্রায় সব গ্রন্থই তাঁর লাইস্যুমে প্রদত্ত আলোচনার সারমর্ম। এদের কোনোটিই পুরোদস্তুর কোনো গ্রন্থ নয়। হয়তো এ্যারিস্টটলের নিজের হাতে রচিত লাইস্যুমে আলোচনা হিসেবে উপস্থাপনার পরিকল্পনা-সংক্ষেপ। প্রায় ক্ষেত্রে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে সিদ্ধান্ত বা অভিমতের উল্লেখ। কিংবা হয়তো লাইস্যুমের শিষ্যদের হাতে গৃহীত এ্যারিস্টটলের শিক্ষাদানের সার-সংক্ষেপ। এখানেই প্লেটোর রচনার সঙ্গে এ্যারিস্টটলের রচনার পার্থক্য। প্রাচীন হলেও প্লেটোর উদ্ধারকৃত রচনা সুসম্পূর্ণ সাহিত্য। এ্যারিস্টটলের রচনা তাঁর প্রজ্ঞার আভাস মাত্র, পূর্ণ পরিচয় নয়।

'পলিটিকস' গ্রন্থ সম্পর্কে পণ্ডিতগণের নানা মত। এ্যারিস্টটলের মৃত্যুর চারশ' বছর পরে পুস্তকাকারে এর প্রকাশ। এতদিন ছিল পাণ্ডুলিপি আকারে। তাঁর অনুসারীগণ এর প্রতিলিপি রক্ষা করেছেন, জ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা একে ব্যবহার করেছে। বর্তমানে আটটি প্রন্ত বা পুস্তকে এ গ্রন্থ বিভক্ত হিসেবে পাওয়া যায়। কিন্তু এ প্রন্ত-বিভাগও এ্যারিস্টটল-পরবর্তীকালের ঘটনা। এ যে কোনো ধারাবাহিক রচনা নয় তা এ থেকেও বোঝা যায় যে, এ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বিষয়ের পুনরুক্ত রয়েছে। অসম্পূর্ণতাও আছে। আলোচনার যে বিষয় একস্থানে উত্থাপিত হয়েছে কিংবা পরবর্তীকালে বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে বিষয়ের, তার আলোচনা অসমাপ্ত রয়েছে। তথাপি 'পলিটিকস' গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীন গ্রিসের রাষ্ট্র এবং সমাজ সংগঠনের, তার জনমানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রেণীবিন্যাসের, তার অর্থনীতির, রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রকারভেদের এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রচিন্তাবিদের যে উল্লেখ এবং তথ্য দেখা যায় এবং মানুষের সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে যে সুচিন্তিত এবং দার্শনিক অভিমত পাওয়া যায়, তা ঐকালের প্রাচীন অন্য রচনাতে দুর্লভ। কেবল সমকালীন শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাৎপর্যের বিষয় নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের মৌলিক সমস্যা নির্ধারণে এ্যারিস্টটলের প্রজ্ঞা অনেক ক্ষেত্রে তাঁর সমাজ ও কালকে অতিক্রম করে নৃবিজ্ঞানের সাধারণ, স্বীকৃত, সার্বজনীন সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কারণে তাঁর 'এথিকস' এবং 'পলিটিকস' অদ্যাবধি সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মাত্রেরই কৌতূহল এবং গবেষণার আকর।

'পলিটিকস' গ্রন্থে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রাষ্ট্রের উদ্ভব, তার উপাদান, রাষ্ট্রের অধিবাসীদের শ্রেণীবিভাগ, তার শাসনব্যবস্থা, সংবিধান, শাসনব্যবস্থার প্রকারভেদ, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক, শাসক এবং নাগরিকের সংজ্ঞা, দাসব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি প্রদান, রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় অস্থিরতা, বিদ্রোহ বা বিপ্লবের সম্ভাব্য কারণ, সে কারণ প্রতিরোধের উপায়—এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা আছে।

এ আলোচনার মধ্যে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে এ্যারিস্টটলের আলোচনাটি বহুমুখী দার্শনিক তাৎপর্যে পূর্ণ। এই আলোচনাটি স্থান পেয়েছে বর্তমান গ্রন্থখানির যে বিন্যাস পাওয়া যায় তার প্রথম প্রস্ত বা পুস্তকের প্রথম দুটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে।

এ্যারিস্টটলের 'পলিটিকস'-এর একটি 'পলেমিকাল' বা প্রতিবাদমূলক ভূমিকা আছে, এটি উল্লেখ করা আবশ্যক। রাষ্ট্র-চিন্তার ক্ষেত্রে এ্যারিস্টটলের সমালোচনার প্রধান লক্ষ্য তাঁর গুরু প্লেটো। প্লেটোর সঙ্গে এ্যারিস্টটলের দর্শনের যে মৌলিক কোনো প্রভেদ আছে, তেমন নয়। প্লেটোর নিকট ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র যেমন আদর্শ, অ্যারিস্টটলের নিকটও ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র তার সকল সামাজিক-রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আদর্শ সংগঠন। প্লেটোর 'রিপাবলিক' গ্রিক নগর রাষ্ট্রেরই একটি আদর্শ রূপ। প্লেটো 'রিপাবলিক' রচনা করেছিলেন গ্রিক নগর-রাষ্ট্রকে তার সামাজিক-রাষ্ট্রীয় অন্তর-সংকট থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। এ্যারিস্টটলও 'পলিটিকস'-এ যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন তার সাধারণ সার্বজনীন রাষ্ট্রীয় চরিত্র সত্ত্বেও সেসব সমস্যা গ্রিক-নগর-রাষ্ট্রেরই সমস্যা এবং প্রচলিত নগর-রাষ্ট্রব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্যই তিনি বিভিন্ন উপায়ের উল্লেখ করেছেন। প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক'-এ সমাধানের ক্ষেত্রে অধিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্পনাপ্রবণ হয়েছেন। এ্যারিস্টটল সমস্যার আলোচনা এবং সমাধানে অভিজ্ঞতা এবং বাস্তবের ওপর অধিকতর নির্ভর করেছেন। কিন্তু প্লেটো তাঁর 'লজ' বা 'আইনসমূহ' নামক গ্রন্থে কল্পনার চাইতে বাস্তব সম্ভাব্যতার ওপর জোর দিয়েছেন। আবার এ্যারিস্টটলও তাঁর সর্বোত্তম রাষ্ট্রের চিন্তায় বাস্তবে যা অপ্রাপ্য তেমন আদর্শের কল্পনা না করে পারেননি। তথাপি 'পলিটিকস' গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে অ্যারিস্টটল প্লেটোকে সমালোচনার পাত্র করেছেন। কোথাও প্লেটোর নাম উল্লেখ করেছেন। কোথাও উল্লেখ করেননি। এ সমালোচনার পেছনে হয়তো প্লেটোর অমিত প্রভাবের বলয় থেকে বেরিয়ে এসে নিজের অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাই অধিক ছিল। এ কারণে গুরুর বিরুদ্ধে তাঁর নিজের সমালোচনার যুক্তি কতখানি ক্ষুরধার, ন্যায্য এবং গ্রাহ্য হলো তার বিবেচনা এ্যারিস্টটল করেননি। অনেক ক্ষেত্রে প্লেটোর বক্তব্যকে বেঠিকভাবে উপস্থিত করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। কাজেই মৌলিক পার্থক্যের কারণে নয়, আপন ব্যক্তিত্ব স্থাপনের কারণেই এ্যারিস্টটল প্লেটোকে অনেক ক্ষেত্রে সমালোচনা করেছেন—এমন অনুমান করা চলে।

'পলিটিকস'-এর প্রথম পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম বাক্যটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের, বিশেষ করে রাষ্ট্রের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য। প্রথম বাক্যটিকে রাষ্ট্রের একটি সংজ্ঞারূপে উপস্থিত করা হয়েছে। 'আমাদের নিজেদের পর্যবেক্ষণ এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, প্রত্যেকটি রাষ্ট্র হচ্ছে কোনো উত্তম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষের সমবায়ে গঠিত একটি সংস্থা।'

এ বাক্যটিতে জ্ঞানালোচনা এবং গবেষণায় এ্যারিস্টটলের সাধারণ এবং উত্তম বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হয়েছে। এ্যারিস্টটলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এ্যারিস্টটল জ্ঞানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের জন্য অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণের মূল্য দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ কারণেই কেবল প্রকৃতিবিজ্ঞান নয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ইতিহাস এবং প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেন। তাই রাষ্ট্র নিয়ে আলোচনার প্রথম বাক্যে তিনি পর্যবেক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে নামের উল্লেখ না থাকলেও প্লেটোকে সামনে রেখে আমরা বাক্যটির মূল্যায়ন করতে পারি। বস্তুত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এখানেই প্লেটোর সঙ্গে এ্যারিস্টটলের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। প্লেটোর রাষ্ট্র-দর্শনের মূল হচ্ছে, রাষ্ট্র-নির্বিশেষ আদর্শ। প্লেটোর দর্শনে বাস্তব গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভাব বা আদর্শ। তাই 'রিপাবলিকে'র একটি বিখ্যাত বাক্য হচ্ছে : দি আইডিয়াল ইজ মোর রিয়াল দ্যান দি রিয়াল : যা আদর্শ তা বাস্তবের চেয়ে অধিক বাস্তব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্লেটোর যুক্তি হচ্ছে আমরা ভাব বা আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হই। বাস্তবকে আমরা পরিচালিত করি আদর্শের লক্ষ্যে। ভাব বা আদর্শ হচ্ছে পরিমাপক। পরিমাপ ব্যতীত যেমন কোনো বস্তুর মূল্যায়ন সম্ভব নয়, এবং মূল্যায়ন ব্যতীত কোনো বস্তুর অস্তিত্ব যেমন মানুষের কাছে নিরর্থক তেমনি আদর্শ রাষ্ট্র হচ্ছে সকল বাস্তব রাষ্ট্রের পরিমাপক। বাস্তব রাষ্ট্র এথেন্স কিংবা স্পার্টা কতখানি ভালো কিংবা মন্দ তা আমরা নির্ধারণ করতে পারি আদর্শ রাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনার ভিত্তিতে মাত্র। ভালো রাষ্ট্রের একটি ধারণা বা ভাব আমাদের আছে বলেই একটি বিশেষ রাষ্ট্রকে খারাপ কিংবা ততো ভালো নয় কিংবা ভালো—এরূপ বলে অভিহিত করি। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুর চাইতে বস্তুর পরিমাপক বড়, অর্থাৎ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ রাষ্ট্রের চাইতে আদর্শ রাষ্ট্রের ভাব বড়। ব্যক্তির চাইতে ব্যক্তির মন বড়। ভাববাদ বনাম বস্তুবাদের লড়াই-এর সূত্রপাত এভাবে প্লেটো থেকেই। তাই রাষ্ট্রের প্রশ্নে 'রিপাবলিক'-এর সক্রেটিসকে যখন প্রশ্ন করা হলো : তোমার আদর্শ রাষ্ট্র কি কোথাও বাস্তবায়িত হয়েছে? কিংবা একে বাস্তবায়িত করা কি সম্ভব? তখন সক্রেটিসের জবাব দিতে অসুবিধা হলো না : তাতে কিছু আসে যায় না। 'তাহলেও আমাদের এই রাষ্ট্র আদর্শ হিসেবে স্বর্গে দীপ্যমান থাকবে।...আমাদের এই রাষ্ট্র কোথাও অস্তিত্বময় থাকুক, কোনোদিন সে অস্তিত্বময় হোক কিংবা না হোক—এই হচ্ছে একমাত্র রাষ্ট্র যার রাজনীতিতে যে উত্তম সে অংশগ্রহণ করতে পারে।

মোটকথা, প্লেটোর দর্শনে কোনো বাস্তব রাষ্ট্রই যথার্থ অর্থে পরিপূর্ণ রাষ্ট্র নয়। কারণ, পরিপূর্ণ রাষ্ট্র হচ্ছে আদর্শ রাষ্ট্র। যে কোনো বাস্তব রাষ্ট্র আদর্শ রাষ্ট্র থেকে নৈকট্য কিংবা দূরত্বের ভিত্তিতে অধিকতর কিংবা অল্পতর অপূর্ণ রাষ্ট্র, পুরো রাষ্ট্র নয়।

এ্যারিস্টটল যে সর্বক্ষেত্রে প্লেটোর ভাববাদের বলয়কে ভাঙতে পেরেছেন এমন নয়। কিন্তু রাষ্ট্রের আলোচনার এই সূচনায় তিনি যে গুরুত্বপূর্ণভাবেই গুরু প্লেটোর সঙ্গে পৃথক মত পোষণ করেছেন, এ কথা বলা যায়। প্রথম বাক্যে প্রদত্ত সংজ্ঞায় এ্যারিস্টটলের নিকট প্রত্যেকটি বাস্তব রাষ্ট্রই রাষ্ট্র। একটি রাষ্ট্র অপর একটি রাষ্ট্র থেকে শাসনগত এবং লক্ষ্যগতভাবে যতোই ভালো কিংবা মন্দ বলে অভিহিত হোক না কেন, প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই হচ্ছে পরিপূর্ণরূপে রাষ্ট্র। এ ক্ষেত্রে কোনো রাষ্ট্রই কোনো রাষ্ট্রের চাইতে অধিকতর কিংবা অল্পতর রাষ্ট্র নয়। কারণ, পর্যবেক্ষণ থেকে আহৃত তথ্যের সাক্ষ্য হচ্ছে এই যে, প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই মানুষের সমবায়ে গঠিত এমন একটি সংস্থা যার সাধন করার মতো একটি লক্ষ্য আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলা চলে একটি উত্তম লক্ষ্য সাধনের জন্য সংগঠিত মানবসংস্থাই হচ্ছে রাষ্ট্র। এ্যারিস্টটল যে কোনো লক্ষ্যকে উত্তম বলার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন : 'আমি উত্তম কথাটি ব্যবহার করছি। কারণ, মানুষ তাদের কর্মকাণ্ডে বস্তুত তাকেই সাধন করার চেষ্টা করে যাকে তারা উত্তম বলে বিবেচনা করে।' এদিক থেকে যে-রাষ্ট্রকে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে আখ্যায়িত করা হবে তার লক্ষ্যও উত্তম। কারণ, স্বৈরতান্ত্রিক শাসক নিজেকে স্বৈরতান্ত্রিক বিবেচনা করে না এবং সে মনে করে না যে, কোনো অধম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে রাষ্ট্র শাসন করছে।

সকল বাস্তব রাষ্ট্রই পুরোপুরি রাষ্ট্র এবং আমাদের পর্যবেক্ষণের এই হচ্ছে সিদ্ধান্ত—এ কথা দ্বারা এ্যারিস্টটল আলোচনার ক্ষেত্রে একটি নতুন পথফলক স্থাপন করেছেন। তিনি রাষ্ট্র আলোচনাকে প্লেটোর বিমূর্ত ভাববাদী দার্শনিক আলোচনা থেকে বার করে এনে বাস্তব অভিজ্ঞতার সম্ভাবনাময় সড়কে দাঁড় করিয়েছেন। এ অবদান তাঁর কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বস্তুত রাষ্ট্রের পর্যবেক্ষণ ও তুলনামূলক এবং ইতিহাসভিত্তিক আলোচনার পথিকৃৎ হচ্ছে এ্যারিস্টটল।

রাষ্ট্র-আলোচনার গোড়ার সংজ্ঞাটিতে প্লেটোর দর্শনকে খণ্ডন করার লক্ষ্যটি স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না হলেও এর কিছু পরে এ্যারিস্টটল যখন বলেন : 'অনেকে এরূপ মনে করেন যে, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে শাসক এবং শাসিতের মধ্যে, রাজা এবং প্রজার মধ্যে, পরিবারের কর্তা এবং পরিবারের মধ্যে দাস এবং প্রভুর সকল সম্পর্ক এক। এদের মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্যের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। এদের মধ্যে আকারগত পার্থক্য অবশ্য বিদ্যমান। কিন্তু আকারগত পার্থক্যই একমাত্র পার্থক্য নয়। কিংবা আকারই এখানে বিচারের নিয়ামক নয়।' তখন আর বুঝতে কষ্ট হয় না যে, এ সমালোচনার লক্ষ্য নির্দিষ্টরূপেই প্লেটো।

ব্যক্তি নিয়ে সমাজ। ব্যক্তি নিয়ে রাষ্ট্র। কিন্তু রাষ্ট্র কি ব্যক্তির হুবহু প্রতিরূপ? রাষ্ট্র কি ব্যক্তির বৃহত্তর আকার মাত্র। সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে এটি একটি মৌল প্রশ্ন। প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে রাষ্ট্রের গঠন এবং প্রকৃতি নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। একটি রাষ্ট্রকে তার প্রাথমিক সংগঠন থেকে শুরু করে তার শাসনব্যবস্থা পর্যন্ত তিনি উদ্ঘাটিত করে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। রাষ্ট্র সংগঠনের গোড়ার কথা বলতে গিয়ে প্লেটো সঠিকভাবেই বলেছেন : ব্যক্তির প্রয়োজন থেকেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি। প্রয়োজনের তাগিদে ব্যক্তি ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে রাষ্ট্র তৈরি করে। কিন্তু এই রাষ্ট্রে শাসনব্যবস্থা কিরূপ হবে? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে প্লেটো বললেন : 'আগে আমাদের স্থির করতে হবে শাসনের নীতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি এবং ন্যায়-শাসন কাকে বলে?' আর এটা স্থির করার জন্যই তিনি ব্যক্তিচরিত্র বিশ্লেষণ করলেন। ব্যক্তিচরিত্র বিশ্লেষণ করে বললেন : ব্যক্তির চরিত্রে তিনটি ভাগ : 'প্রজ্ঞা, বিক্রম এবং প্রবৃত্তি। আর ব্যক্তির জীবনে শাসনের নীতি হচ্ছে : প্রজ্ঞা প্রবৃত্তিকে শাসন করে এবং বিক্রম এ ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাকে সহায়তা দান করে।' প্লেটো বললেন, ব্যক্তির চরিত্রে যেমন তিনটি ভাগ, রাষ্ট্রের চরিত্রেও তিনটি ভাগ। রাষ্ট্রের মানুষকেও তিন ভাগে ভাগ করা চলে। এক ভাগের মধ্যে প্রজ্ঞার আধিক্য, এক ভাগের মধ্যে বিক্রমের, আর এক ভাগের মধ্যে প্রবৃত্তির আধিক্য। প্রজ্ঞার আধিক্য জ্ঞানীর মধ্যে, অভিজাতদের মধ্যে। বিক্রমের আধিক্য দৈহিক শক্তির অধিকারীর মধ্যে। প্রবৃত্তির আধিক্য শ্রমজীবী, মানে উৎপাদকদের মধ্যে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা বা আত্মা যেমন হাত, পা ও উদরের প্রবৃত্তিকে শাসন করে এবং দেহের শক্তি আত্মার এই শাসনকে প্রয়োগ করে, তেমনি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে জ্ঞানীরা শাসক হবে এবং শ্রমজীবী বা উৎপাদকরা শাসিত হবে। বিক্রম বা শক্তিধর অর্থাৎ সৈন্যবাহিনী শাসকের এই শাসন উৎপাদকের ওপর প্রয়োগ করবে। ব্যক্তির চরিত্রকে রাষ্ট্রের ওপর এমনি সহজ এবং সরল আরোপে প্লেটোর কোনো অসুবিধা হয়নি। কারণ, প্লেটোর যুক্তি হচ্ছে: রাষ্ট্র হচ্ছে ব্যক্তির বৃহৎ আকার। 'স্টেট ইজ ইনডিভিজুয়াল রিট লার্জ'। প্লেটোর মূল উদ্দেশ্য দাস ও শ্রমজীবী মানুষের ওপর জ্ঞানী তথা অভিজাতদের শাসনকে যুক্তি সহকারে দৃঢ় করা। দাস এবং শ্রমজীবী মানুষের সংশয়, প্রশ্ন এবং প্রতিক্রিয়াকে শান্ত করা। এ মূল উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে এ্যারিস্টটলও পৃথক নন। কিন্তু ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্লেটো এবং এ্যারিস্টটলের যুক্তির পার্থক্যের দার্শনিক তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ব্যক্তি দিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হলেও, ব্যক্তিই যে রাষ্ট্র নয়, অর্থাৎ রাষ্ট্র যে ব্যক্তির বৃহত্তর আকার মাত্র নয়—এ্যারিস্টটলের এ উক্তি বিশেষ অর্থবহ। এ উক্তির মধ্যে এমন উপলব্ধি স্পষ্ট যে, সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যক্তির সমাহার মাত্র নয়। ব্যক্তি যখন ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হয়, যখন বহু ব্যক্তি পারস্পরিক লেনদেনের, সংযোগ এবং সহযোগিতার, আশা এবং প্রত্যাশার সম্পর্কে জড়িত হয় তখন যে সংস্থার জন্ম ঘটে তার চরিত্র বা প্রকৃতি এ সংস্থার একক বা উপাদান থেকে ভিন্নতর। এ প্রায় যৌগিক রাসায়নিক সংস্থার অনুরূপ। বিজ্ঞানের সাধারণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, হাইড্রোজেন অণু এবং অক্সিজেন অণুর সম্মিলনে যে সংস্থা অর্থাৎ পানির সৃষ্টি হয় সেটি চরিত্রগতভাবে না হাইড্রোজেন, না অক্সিজেন। সে উভয় উপাদান থেকে একেবারেই ভিন্ন। একটি জটিল যৌগিক সংস্থার একক এবং সমগ্রের চরিত্রের এই পারস্পরিক পার্থক্য বস্তুজগতের ক্ষেত্রে আমরা যতো সহজে অনুধাবন করতে পারি, আমাদের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেদের অর্থাৎ মানুষের সমাজের একক এবং সমগ্রের ক্ষেত্রে সেটি অনুধাবন করা ততো সহজ নয়। এ্যারিস্টটলের বৈশিষ্ট্য এবং কৃতিত্ব এই যে, প্লেটোর পক্ষে এই পার্থক্য অনুধাবন করা যেখানে সম্ভব হয়নি, এ্যারিস্টটল সেখানে এটি নির্দিষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন। এই বোধটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন এ্যারিস্টটল বলেন : 'রাজা প্রজার সম্পর্কটি যথার্থই পৃথক। এটি একটি রাজনৈতিক বা শাসনগত সম্পর্ক। এখানে একটি নাগরিক সংস্থার পার্থক্য বিদ্যমান। একটি গুণগত পার্থক্যের অস্তিত্বকে এখানে আমাদের স্বীকার করতে হয়।'

রাষ্ট্র একটি যৌগিক সংস্থা। এই জটিল যৌগিক সংস্থার চরিত্র সঠিকভাবে বোঝার ওপরই নির্ভর করে রাষ্ট্রকে উত্তমরূপে শাসন বা পরিচালনার প্রশ্ন। আদর্শ রাষ্ট্র সংস্থা সকলেরই কাম্য। কিন্তু ন্যায়ের একটি আদর্শ ভাব সামনে রাখাই কি রাষ্ট্রকে উত্তম করার জন্য যথেষ্ট? রাষ্ট্রসংস্থাকে যদি উত্তম করতে হয় তাহলে রাষ্ট্রসংস্থার সঠিক চরিত্রকে নির্দিষ্ট করতে হবে এবং তাকে অনুধাবন কতে হবে। কিন্তু যৌগিক রাষ্ট্র-সংস্থার সঠিক চরিত্র আমরা কেমন করে অনুধাবন করতে পারি? এ্যারিস্টটলের জবাব যেমন স্পষ্ট তেমনি তাঁর সে জবাব সমাজবিজ্ঞান অনুধাবনের নতুন পদ্ধতি নির্দিষ্ট করার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এ্যারিস্টটলের জবাব হচ্ছে : কোনো যৌগিক সংস্থার চরিত্র উপলব্ধি করা যায় যৌগিক অস্তিত্বকে তার গঠনগত উপাদানে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে। যৌগিককে ভেঙে তার উপাদানে উপনীত হতে হবে। উপাদানের প্রকৃতির এবং শক্তির ওপরই উপাদানের সম্মেলনে গঠিত অস্তিত্বের শক্তি। এখানে দুটো প্রক্রিয়া নিহিত। একটি হচ্ছে, উপাদান দিয়ে যৌগিককে গঠন করা। এ্যারিস্টটলের আলোচনায় এই দুটো প্রক্রিয়ারই স্বীকৃতি স্পষ্ট। রাষ্ট্রসংস্থা সাধারণ বস্তুর ন্যায় বিভাজ্য বস্তু নয়। তবু এ্যারিস্টটলের বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রকৃষ্ট প্রকাশ এখানে যে, তিনি রাষ্ট্রসংস্থার ক্ষেত্রেও এই দুটি প্রক্রিয়াকে যথাসম্ভব প্রয়োগ করা যে আবশ্যক, দ্ব্যর্থহীনভাবে সে কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন। এ্যারিস্টটল বলেছেন, 'আমরা সাধারণত কি করি? আমরা একটি যৌগিক বা মিশ্র সংস্থাকে তার অন্তর্গত উপাদানে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। এই বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াটি নিয়ে আমরা অগ্রসর হতে থাকি এবং যতোক্ষণ না তার অন্তর্গত উপবিভাগগুলি নিঃশেষ করে তার মূল উপাদানে আমরা পৌঁছতে পারি ততোক্ষণ বিশ্লেষণের কাজটি শেষ হলো বলে আমরা মনে করি। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে যদি আমরা তার অন্তর্গত উপাদানগুলিতে বিভক্ত করি তাহলে অধিকতর উত্তমরূপে আমরা এর অংশগুলির পারস্পরিক পার্থক্য অনুধাবন করতে সক্ষম হব এবং এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপাদানগুলির মধ্যে ক্রিয়াশীল কোনো নিয়মকে স্থির করা যায় কি না—সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও আমাদের পক্ষে তখন সহজতর হয়ে দাঁড়াবে।

এ্যারিস্টটলের এ অভিমতের শেষ অংশটিও গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছে। মানুষ বিশ্বাস করে প্রকৃতি-জগত নিয়মের অধীন। প্রকৃতি-জগতের নিয়মকে জেনেই মানুষ তাকে আয়ত্ত করতে পারবে, তাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে। যত অধিক পরিমাণে বিশ্বজগতের নিয়মকে সে জানতে পারবে তত অধিক পরিমাণে বিশ্ব-প্রকৃতি সম্পর্কে সে নিশ্চিত হতে পারবে, তত অধিক পরিমাণে সে তাকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে।

কিন্তু মানুষের সমাজ এবং রাষ্ট্র কিরূপ অস্তিত্ব? মানুষই তো সমাজের উপাদান। মানুষ সমাজকে সৃষ্টি করে। সমাজ তার নিজের অস্তিত্বের বাইরের কোনো অস্তিত্ব নয়। প্রকৃতি-জগত তার বাইরের অস্তিত্ব। প্রকৃতি তার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া দেখতে পারে। সে আকাশকে নিরীক্ষণ করতে পারে। নিরীক্ষণ করতে পারে তার চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকা। তাদের উদয়-অস্তের নিয়ম সে আবিষ্কার করতে পারে। কিন্তু মানুষ কি পারে মানুষের সমাজকে নিরীক্ষণ করতে, তাকে পর্যবেক্ষণ করতে এবং তার নিয়ম কানুনকে আবিষ্কার করতে? আসলে মানুষের সমাজের কি কোনো স্থির নিয়মকানুন আছে? প্রকৃতি-জগতের ন্যায়, তার বস্তুর ন্যায়? এ প্রশ্নের অবিসংবাদিত মীমাংসা আজো হয়নি। কিন্তু একথা ঠিক যে, মানুষের সমাজও একটা বিশিষ্ট সত্তাসম্পন্ন অস্তিত্ব, তারও একটা নিজস্ব নিরীক্ষণযোগ্য বিধিবিধান আছে যা কোনো ব্যক্তিমানুষের মনের ব্যাপার নয়, অর্থাৎ যা ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে না—এরূপ অভিমত পোষণের পূর্বশর্ত হচ্ছে এই ধারণা যে, সমাজ এবং রাষ্ট্র মানুষের সৃষ্টি হলেও সে মানুষ-নিরপেক্ষ প্রকৃতির মতোই এক অস্তিত্ব। তাকে নিরীক্ষণ করা যায় এবং নিরীক্ষণ করে তার অন্তর্নিহিত নিয়মকে নির্দিষ্ট করা যায়। সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে এরূপ ধারণা আজও যেমন সর্বজনস্বীকৃত নয়, তেমনি এ্যারিস্টটলের যুগে এ ধারণা একেবারেই অচিন্ত্যনীয় ছিল। তাই এক্ষেত্রে এ্যারিস্টটলের এরূপ ধারণা সমাজবিজ্ঞানে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্মোচনে তাৎপর্যপূর্ণ—একথা যথার্থরূপেই আমরা বলতে পারি।

এই অভিমতের অধিকতর দ্ব্যর্থহীন প্রকাশ ঘটেছে যখন এ্যারিস্টটল রাষ্ট্রের প্রকৃতি প্রসঙ্গে বলেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিন্তু সর্বোচ্চ বা চরম সংস্থা হচ্ছে নগর বা রাষ্ট্র। একাধিক গ্রামের সম্মেলনে গঠিত হয় রাষ্ট্র। বিকাশের যে ধারা আমরা বর্ণনা করেছি তাতে বলা চলে রাষ্ট্রে এই বিকাশের সমাপ্তি ঘটেছে।...আমাদের পূর্বের বক্তব্যের অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্র শ্রেণী বা প্রকারগতভাবে সেই বস্তুরই অন্তর্গত যার একটি প্রাকৃতিক সত্তা রয়েছে এবং প্রকৃতিগতভাবে মানুষ হচ্ছে রাষ্ট্রনৈতিক প্রাণী। মানুষের স্বভাব হচ্ছে রাষ্ট্র সৃষ্টি করা, রাষ্ট্রে বাস করা।'

'প্রকৃতি' বা 'প্রকৃতিগত বা ন্যাচারাল' শব্দের ব্যবহার এ্যারিস্টটল তাঁর 'পলিটিকস' আলোচনার একাধিক জায়গাতে করেছেন। সর্বত্র যে একই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এমনও নয়। কোথাও যা অপরিণত কিংবা আদিম তাকে প্রাকৃতিক বা প্রকৃতিগত বলেছেন। আবার কোথাওবা মানুষের জন্য অনিবার্য এবং মানুষ-নিরপেক্ষভাবে যার অস্তিত্ব রয়েছে 'প্রকৃতি' বলতে তিনি তাকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু প্রথম পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাষ্ট্রের মূল চরিত্র নির্ধারণে 'প্রাকৃতিক' শব্দের ব্যবহার দ্ব্যর্থহীন এবং দার্শনিক তাৎপর্যে পূর্ণ। মানুষ রাষ্ট্র গঠন করে। কিন্তু তাই বলে আমরা কি বলতে পারি, মানুষ ইচ্ছা করলে সমাজ বা রাষ্ট্র গঠন নাও করতে পারে? এ্যারিস্টটল বলেন, না, মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। 'মানুষের স্বভাব হচ্ছে রাষ্ট্র সৃষ্টি করা।...এমন মানুষ যদি পাওয়া যায় যে রাষ্ট্রহীন...তাহলে আমরা সে মানুষকে হয় অধমের অধম, নয়ত উত্তমের উত্তম, অমানুষ কিংবা অতিমানুষ বলে গণ্য করব।'

সমাজ বা রাষ্ট্র হচ্ছে মানুষের জীবনে অনিবার্য। রাষ্ট্র হচ্ছে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক। কারণ, এর ব্যক্তিনিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। একটা পর্বত বা সমুদ্র প্রাকৃতিক। কারণ, পর্বত বা সমুদ্রের অস্তিত্ব ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে না। ব্যাখ্যা হিসেবে আমরা বলতে পারি, এ্যারিস্টটল এখানে স্বাভাবিক বা ন্যাচারাল বলতে কৃত্রিমের বিপরীত অর্থ বোঝাতে চেয়েছেন। ভাস্করের হাতে তৈরি মূর্তি একদিক থেকে কৃত্রিম বা অপ্রাকৃতিক। কারণ, ভাস্করের মূর্তির অস্তিত্ব ভাস্কর-নিরপেক্ষ নয়। ভাস্কর ইচ্ছা করলে মূর্তিটি তৈরি করতে পারে; ইচ্ছা করলে নাও করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র বা সমাজকে মানুষ তৈরি করে বটে। তবু রাষ্ট্র বা সমাজ এমন অস্তিত্ব নয় যাকে মানুষ ইচ্ছা করলে তৈরি নাও করতে পারে। কারণ, এ হচ্ছে মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। 'কোনো বস্তু বা সত্তার স্বভাব বা প্রকৃতি বলতে আমরা কি বুঝি? মানুষ কিংবা পরিবার কিংবা অপর যা কিছুই হোক না কেন, এদের চরম বিকাশই হচ্ছে এদের স্বভাব।' এ্যারিস্টটলের এরূপ উক্তি বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না। বীজের স্বভাব বৃক্ষ হওয়া। শিশুর স্বভাব মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়া। কিন্তু এমন স্বভাবেরও দুটো দিক আছে। উপযুক্ত আলো-হাওয়া-মাটিতে বীজ বৃক্ষ হতে বাধ্য। উপযুক্ত পরিচর্যায় শিশুও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হতে বাধ্য। উপযুক্ত অবস্থায় মানুষও রাষ্ট্রগঠনে বাধ্য। কিন্তু বীজের বৃক্ষে পরিণত হওয়ার অনিবার্যতা এবং মানুষের রাষ্ট্রগঠনের অনিবার্যতা কি এক? এক্ষেত্রে এ্যারিস্টটলের চিন্তা অস্পষ্ট নয়। এ দুটি অনিবার্যতা এক নয়। বীজের স্বভাব আছে। পশুর স্বভাব আছে। মানুষেরও স্বভাব আছে। কিন্তু পশু ও মানুষের স্বভাবের বিকাশে তার নিজেরও একটি সক্রিয় ভূমিকা আছে। তার স্বভাবের অনিবার্য বিকাশ বটে। তবু এ বিকাশকে তার বুদ্ধি এবং যুক্তি দ্বারা সে পূর্ণতর বা সহজতর করতে পারে। সমাজ ও রাষ্ট্রের অনিবার্য বিকাশে সমাজ বা রাষ্ট্রের উপাদান তথা মানুষের যে একটি সক্রিয় ভূমিকাও বিদ্যমান এই উপলব্ধির সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটিয়ে এ্যারিস্টটল বলেছেন : 'আমরা বলব, সমস্ত মানুষের মধ্যেই রাষ্ট্রের এই অংশীদারিত্বের একটি স্বাভাবিক আবেগ বিদ্যমান। এবং যে ব্যক্তি প্রথম রাষ্ট্রকে গঠন করেছে সে অবশ্যই মানবজাতির প্রভূত উপকার সাধন করেছে এবং এজন্য সে কৃতিত্বের দাবিদার।'

মানুষের এই ভূমিকার ক্ষেত্রেই এসেছে এ্যারিস্টটলের এরূপ উক্তি : 'তাছাড়া রাষ্ট্র যে কেবল পরিণাম তা নয়। পরিবার এবং ব্যক্তির পূর্বগামীও হচ্ছে রাষ্ট্র। কারণ সমগ্র হচ্ছে অংশের পুরোগামী। সমগ্রের মধ্যেই অংশের অস্তিত্ব।' এ্যারিস্টটলের এরূপ উক্তির তাৎপর্য এই যে, এ্যারিস্টটল সমাজ বা রাষ্ট্রকে কেবল ব্যক্তি-নিরপেক্ষ প্রাকৃতিক অস্তিত্ব বলে থামেননি। তেমন হলে রাষ্ট্র উদ্দেশ্যহীন হয়ে যায়। কিন্তু রাষ্ট্র হচ্ছে মানুষের সমবায়ে সংগঠিত সংস্থা। এবং যেহেতু মানুষই রাষ্ট্র গঠন করে, সে কারণে রাষ্ট্রের ভাব যদি সূচনাতেই তার মনে না থাকে তাহলে মানুষের পক্ষে রাষ্ট্র গঠন সম্ভব হতে পারে না। ভাস্কর মূর্তি তৈরি করে। পরিপূর্ণ মূর্তিটি তার কাজের শেষ পরিণতি। কিন্তু মূর্তিটির ধারণা যদি সূচনাতে তার মনে না থাকে তাহলে মূর্তি হিসেবে প্রস্তরখণ্ডের পরিণামও অসম্ভব হয়ে পড়ে। এদিক থেকে রাষ্ট্র যেমন শেষ, তেমনি সূচনাও বটে। তাছাড়া রাষ্ট্র হচ্ছে একটি সমগ্র সত্তা। ব্যক্তি হচ্ছে তার উপাদান। সমাজের মধ্যেই ব্যক্তির অস্তিত্ব। সমাজের বাইরে ব্যক্তির যথার্থ অস্তিত্ব অকল্পনীয়। এ কারণে বলা চলে সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যক্তির পূর্বগামী।

উপরের আলোচনাতে একটি কথা প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে যে, 'পলিটিকস' গ্রন্থের প্রথম দুটি অধ্যায়ের কয়েকটি উক্তি বিশেষ দার্শনিক তাৎপর্যে পূর্ণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ্যারিস্টটল সমাজ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে এই দুটি অধ্যায়ে (কিংবা সমগ্র 'পলিটিকস' গ্রন্থে) কোনো সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দিষ্ট করেননি। শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজই রাষ্ট্র। আর তাই রাষ্ট্রের বাইরে তিনি মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারেননি।

সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক বিকাশের বৈশিষ্ট্য এই যে, সমাজ এবং রাষ্ট্র এক নয়। মানুষের জীবনের বিকাশের এক পর্যায়ে রাষ্ট্র-সংগঠনের উৎপত্তি। রাষ্ট্র মানুষের স্বভাবের প্রকাশ বটে, কিন্তু রাষ্ট্রের বাইরে মানুষের অস্তিত্ব অকল্পনীয় নয়। রাষ্ট্র বলতে আধুনিককালে প্রধানত দণ্ড প্রয়োগের ক্ষমতাসম্পন্ন শাসনকে বোঝায়। এরূপ সংগঠন ছাড়াও সামাজিক জীবন মানুষ হয়তো এক সময়ে যাপন করেছে। কারণ রাষ্ট্র বলতে বিভিন্ন বিভাগে সংগঠিত যে শাসনব্যবস্থা বোঝায় সেরূপ জটিল সংগঠন প্রকৃতির ওপর এককালে একান্তভাবে নির্ভরশীল, অসহায় মানুষের বিকাশ প্রক্রিয়ার আদিতে ছিল, এরূপ কল্পনা করা চলে না। তাছাড়া রাষ্ট্র বলতে যেরূপ জবরদস্তিসূচক একটি ব্যবস্থা বোঝায়, অন্তত যে কোনো রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু যেখানে জবরদস্তি, সেখানে বিকাশমান মানুষ তার জীবনের ভবিষ্যতে কোনো পর্যায়ে জবরদস্তি ব্যতিরেকে যুক্তির ভিত্তিতে পরস্পরের সঙ্গে যৌথ সামাজিক জীবনযাপন করতে পারবে না, এমনও কল্পনা করার কারণ নেই।

AMARBOI.COM

কিন্তু বড় কথা এই যে, এ্যারিস্টটল সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য নির্দিষ্ট করেননি। বড় কথা এই যে, এ্যারিস্টটল সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছেন যে, সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক হচ্ছে একটি দ্বৈত সম্পর্ক যেখানে সমাজ যেমন অনিবার্য তেমনি সে মানুষের সক্রিয় উদ্যোগেরও সৃষ্টি। সে যেমন প্রাকৃতিক, তেমনি সে মানবিক। প্রকৃতি যেমন তাকে তৈরি করে, সেও প্রকৃতিকে তেমনি তৈরি করে।

সমাজ এবং রাষ্ট্রের সম্পর্কে এরূপ সামগ্রিক চেতনার আভাসদানে এ্যারিস্টটল প্রাচীন ইতিহাসের এক অনন্য সমাজবিজ্ঞানী।

এ্যারিস্টটলের 'পলিটিকস' পাঠে আমরা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা অনুধাবনে তাঁর আর একটি অন্তর্ভেদী দৃষ্টির পরিচয় পাই। মানুষের সামাজিক জীবনের মূল যে তার জীবনধারণের চেষ্টা তথা তার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, এ কথা এ্যারিস্টটল স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন।

'পলিটিকস'-এর প্রথম পুস্তকের নবম অধ্যায়ে এ্যারিস্টটল অর্থনৈতিক বিকাশের মূলসূত্রকে অনবদ্য সরলতায় বর্ণনা করেছেন। কেবল তাই নয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের তৈরি জটিল রাষ্ট্র সংগঠনের শাসনব্যবস্থা তথা তার অদল-বদল, তার উত্থান-পতন, তার ভেতরের বিদ্রোহ-বিপ্লব যে নিগূঢ়ভাবে রাষ্ট্রের মানুষের মধ্যে আর্থিক সম্পদের ভিত্তিতে বিভক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর আর্থিক অবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত, এ সত্যও এ্যারিস্টটল তাঁর আলোচনায় বিভিন্ন সময়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে অস্থিরতা এবং পরিবর্তনের মূল কারণ নির্দিষ্ট করে এ্যারিস্টটল বলেছেন : বিপ্লবের মূল কারণ হচ্ছে সাম্য এবং অসাম্যবোধ তথা অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সাম্য অবস্থা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। শাসনব্যবস্থার প্রকারভেদ সম্পর্কে সুবিস্তারিত আলোচনা আছে 'পলিটিকস'-এ। 'রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং পলিটি'—এ্যারিস্টটলের এমন শ্রেণীবিভাগ প্রাচীনকালে প্রচলিত শাসনব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগের স্বীকৃতি হলেও শাসনব্যবস্থার এমন বিস্তারিত আলোচনা অপর কোনো চিন্তাবিদের মধ্যে দুর্লভ। এবং শাসনব্যবস্থার এই শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রেও এ্যারিস্টটল গুরুত্ব দিয়েছেন শাসকদের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর। তাই গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ্যারিস্টটল বলেছেন : 'গণ' তথা 'ডিমস' (Demos) সংখ্যায় যেমন অধিক, তেমনি তারা দরিদ্র। তাই 'গণতন্ত্র' বললে 'দরিদ্রদের শাসন' বোঝাই সঙ্গত। এমন যদি হয় যে একটি রাষ্ট্রে দরিদ্রদের সংখ্যা কম, কিন্তু তারাই তার শাসক, তাহলে এ শাসনকে শাসকের সংখ্যাল্পতার কারণে 'কতিপয়তন্ত্র' বলে আখ্যায়িত যদিচ করা হয়, কিন্তু একে শাসকদের অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে যথার্থই 'গণতন্ত্র' বলে আখ্যায়িত করা উচিত। এবং অনুরূপভাবে অর্থবানরা যদি সংখ্যায় অধিক হয় এবং তারাই শাসক হয় তাহলে এমন শাসনকে সংখ্যার কারণে গণতন্ত্র না বলে ধনতন্ত্র বলাই সঙ্গত। এ্যারিস্টটলের নিজের কথায় :

মনে করা যাক একটি নগরীতে এক হাজার তিনশত নাগরিক আছে। এদের মধ্যে এক হাজার জন ধনবান। এবং শাসনের ক্ষেত্রে অপর তিনশত জন দরিদ্রের কোনো অংশ নেই। এ তিনশত জনও স্বাধীন নাগরিক। অপরদের সঙ্গে ধনের ক্ষেত্র ব্যতীত তারা সমান। এমন ক্ষেত্রে কারুর বলা উচিত নয় যে তেরশতের এই নগরীর ব্যবস্থা হচ্ছে গণতান্ত্রিক। অপরদিকে মনে করা যাক, যারা দরিদ্র তারা সংখ্যায় অল্প। তথাপি তারা শাসনক্ষমতা দখল করছে এবং সংখ্যায় অধিক যে ধনবান তাদের ওপর শাসন করছে। এমন ক্ষেত্রেও ধনবানদের যদি শাসনে আদৌ কোনো অংশ দেওয়া না হয়, তাহলে এ ব্যবস্থাকেও কতিপয়তন্ত্র বলা সঙ্গত হবে না। আমাদের বরঞ্চ এ কথা বলাই সঙ্গত যে, দরিদ্রগণ যেখানে সার্বভৌম সেখানকার ব্যবস্থা হচ্ছে, গণতন্ত্র এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধনবানগণ যেখানে সার্বভৌম সেখানকার ব্যবস্থা হচ্ছে 'কতিপয়তন্ত্র'। অবশ্য বাস্তবে যে বিষয়টিকে আমরা দেখি, সে হচ্ছে এই যে, দরিদ্রগণ সংখ্যায় অধিক এবং ধনিকগণ সংখ্যায় অল্প। অধিক হচ্ছে দরিদ্র, অল্প হচ্ছে ধনিক।...কাজেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হবে সেটি যেখানে স্বাধীন নাগরিকদের মধ্যে যারা দরিদ্র তারা তাদের সংখ্যায় আধিক্যের শক্তিতে নগরীর সরকার পরিচালনা করে এবং কতিপয়তন্ত্র হচ্ছে সেই ব্যবস্থা যেখানে সংখ্যাল্প ধনিক এবং অভিজাতদের হাতে সরকার পরিচালনা ন্যস্ত থাকে।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এ্যারিস্টটলের কালজয়ী অবদানের মধ্যে আইনের শাসনের ওপর তাঁর গুরুত্ব প্রদানকে অন্যতম অবদান বলে বিবেচনা করেন। এ মূল্যায়নটি যথার্থ। কোন শাসন উত্তম, এ আলোচনাও 'পলিটিকস'-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। একের শাসন, কতিপয়ের শাসন, না বহুর শাসন? প্রথমে এ্যারিস্টটল এরূপ বিভিন্ন প্রকার শাসনের গুণাগুণের আলোচনা করেছেন। কিন্তু অন্তিমে তিনি বলেছেন যে, এক কতিপয় কিংবা বহুজন—এরা জ্ঞানী, গুণী, মহানুভব যাই হোক না কেন, এরা ব্যক্তি। এবং এক, কতিপয় কিংবা বহুকে যদি রাষ্ট্রে সার্বভৌম বলা হয়, তাহলে তা হবে ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব। কিন্তু রাষ্ট্রে সার্বভৌম শক্তি হওয়া উচিত আইনের, ব্যক্তির নয়। কারণ ব্যক্তির মধ্যে আবেগ, ইচ্ছা, অনিচ্ছা আছে। ব্যক্তির শাসন হচ্ছে আবেগের তথা প্রবৃত্তির শাসন। কিন্তু আইনের শাসন মানে যুক্তির শাসন। এ্যারিস্টটলের এই যুক্তি মানুষের রাষ্ট্রবদ্ধ জীবনের এক চিরন্তন লক্ষ্যকে নির্দিষ্ট করেছে। রাষ্ট্র নির্বিশেষে আধুনিক মানুষের নিত্যদিনের সংগ্রাম হচ্ছে ব্যক্তি বনাম আইনের শাসনের সংগ্রাম। মানুষের রাষ্ট্রীয় জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ক্রমাধিক পরিমাণে ব্যক্তির শাসনের স্থলে আইনের শাসনের প্রতিষ্ঠা।

'...ন্যায়ের দাবি হচ্ছে, শাসিত হওয়ার পরিমাণের চেয়ে অধিকতর শাসক কেউ হবে না। শাসনের ক্ষেত্রে পালাক্রমে সকলেরই সুযোগ থাকতে হবে।...পালাক্রমে শাসনের কথা হচ্ছে আইনের কথা। এ থেকে আমরা বলতে পারি; আইনের শাসনই অধিকতর কাম্য, কোনো একজন নাগরিকের শাসন নয়। ...কাজেই যিনি বলেন, আইনের শাসন করা উচিত তিনি দেবতা এবং যুক্তিকেই শাসক হতে বলেন, অপর কাউকে নয়। কিন্তু যিনি কোনো মানুষকে শাসক বানাতে চান, তিনি তার দ্বারা একটি বন্য জন্তুকেই আমন্ত্রণ করে আনেন। কারণ মানুষের প্রকৃতি বন্য জন্তুর মতো। প্রবল আবেগ শাসক এবং মানুষের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বোত্তমকে পর্যন্ত ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। কিন্তু আইনের মধ্যে আবেগশূন্য যুক্তির অধিষ্ঠান।...

...আইন যেখানে শাসন করে না সেখানে কোনো শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকে না। সকলের ওপরই আইনের শাসন থাকা আবশ্যক।

এ্যারিস্টটল যে একটি বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে রাষ্ট্রের সকল রোগ-ব্যাধি তথা সমস্যাকে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন এ সত্য তাঁর বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্ব এবং পরিবর্তনের আলোচনাতে সমধিক প্রকাশিত হয়েছে। সংবিধানে বা শাসনব্যবস্থার প্রকারভেদ আছে। কিন্তু যে কোনো শাসনব্যবস্থারই তো ইচ্ছে টিকে থাকার। সেদিক থেকে যে কোনো শাসনব্যবস্থা কি প্রকারে অধিকতর দীর্ঘ জীবন লাভ করতে পারে, তাই হচ্ছে প্রকার নির্বিশেষ সকল শাসনব্যবস্থা এবং তার শাসকদের উদ্বেগের বিষয়। চিকিৎসকের সন্তান এ্যারিস্টটল এক্ষেত্রে চিকিৎসকের একটি নিরাবেগ এবং নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রত্যেক প্রকার শাসন-ব্যবস্থার মধ্যকার বিকার তথা অস্থিরতা এবং বিদ্রোহ-বিপ্লব-পরিবর্তনের মূল কারণ চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। এবং চিকিৎসক যেমন রোগের 'ভালো-মন্দ' বিচার করে তাঁর সহজ-কঠিন প্রত্যেক প্রকার রোগীর রোগের নিরাময়পত্র দান করেন, একেবারে অনুরূপভাবে এ্যারিস্টটল রাজতন্ত্র, কতিপয়তন্ত্র কিংবা গণতন্ত্র, প্রত্যেক প্রকার শাসনব্যবস্থার অস্থিরতা ও বিপ্লবের কারণ নির্দেশ করেছেন। তাঁর নির্দিষ্ট কারণসমূহ কেবল প্রাচীন গ্রিসের রাষ্ট্রসমূহের বিশিষ্টতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সে সকল কারণ আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনের বিদ্রোহ-বিপ্লবেও প্রকৃষ্টভাবে কার্যরত।

AMARBOI.COM

এ্যারিস্টটলের পলিটিকস-এর পঞ্চম পুস্তকের পুরো আলোচনাটি ব্যয়িত হয়েছে। রাষ্ট্র অস্থিরতা তথা বিপ্লবের বিশ্লেষণের ওপর। এটিকে যথার্থভাবে এ্যারিস্টটলের 'বিপ্লবত্ব' বলে অভিহিত করা চলে। রাষ্ট্রে যে কোনো প্রকার পরিবর্তন এবং অস্থিরতার এমন সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত আলোচনা কেবল প্রাচীনকালের ক্ষেত্রে নয়, আধুনিককালেও বিরল।

এ সমস্যার আলোচনা শুর করতে গিয়ে এ্যারিস্টটল কালনির্বিশেষে মানুষের জীবনে প্রবহমান বোধের প্রকাশ করে বলেন :

'রাষ্ট্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের মূলে সাধারণ কারণ হচ্ছে অসাম্য। কারণ, মানুষ যাকে ন্যায়সঙ্গত এবং সমান বলে বিবেচনা করে তার ভিত্তিতে তারা বিভক্ত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে। দুই রকম সমতা আছে। এর একটি হচ্ছে সংখ্যাগত সমতা। অপরটি হচ্ছে মান তথা গুণগত সমতা।...

কেবল যে শ্রেণীগত বা রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অসাম্য বিপ্লবের উৎস হিসেবে কাজ করে, তাই নয়। স্থানিকভাবে একই রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যদি উন্নতির বৈষম্য ঘটে তবে সে বৈষম্যও যে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণ হতে পারে তারও অতি স্পষ্ট আভাস দিয়ে এ্যারিস্টটল বলেন :

'অনেক সময়ে ভৌগোলিক কারণেও অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। রাষ্ট্রের ভৌগোলিক বিন্যাস রাষ্ট্রের ঐক্যের অনুকূল না হতে পারে।... এ কথা আমরা জানি, যুদ্ধের মধ্যে অনেক সময়ে নদী কিংবা অপর কোনো জলস্রোত পারাপারের কারণে সৈন্যরা বিভক্ত হয়ে পড়ে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও সেরূপ বিভিন্নতা থেকে বিভাগের সৃষ্টি হয়।...

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বিষম গঠনে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং তার ঐতিহাসিক পরিণাম যে এ্যারিস্টটলের এই বিশ্লেষণের একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

AMARBOI.COM

কোনো সমাজের মানুষের মধ্যকার অসাম্য যে কিরূপ বিসদৃশ হতে পারে তার অনবদ্য প্রকাশ দেখা যায় এ্যারিস্টটলের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যাটিতে :

'...সমাজের অপর অংশের তুলনায় বিষম বিকাশ কীভাবে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের কারণ হতে পারে তার দৃষ্টান্ত আমাদের দেহের সঙ্গে তুলনাক্রমে দেওয়া চলে। দেহ বিভিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত এবং যাতে সমগ্রের উপযুক্ত ভারসাম্য বিনষ্ট হতে না পারে এবং দেহ বিকল হয়ে না যেতে পারে সেজন্য সকল অংশের বৃদ্ধিকেই আনুপাতিক হতে হয়। বিষম অবস্থা দাঁড়ায় তখন, যখন এক ফুট উঁচু দেহতে এক গজ লম্বা পা গজিয়ে যায় কিংবা দেহের কোনো অংশে মানুষের পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্ভূত হতে থাকে।

এ্যারিস্টটল রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিবর্তনকে অস্বীকার করেননি। বরঞ্চ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বিকাশ এবং পরিবর্তন যে প্রকৃতির মতোই প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক তা 'পলিটিকস'-এর আলোচনাতে স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাসক বা শাসনব্যবস্থার মানবিক অপর এক স্বভাবও যে পরিবর্তনকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা, তাও তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তথা 'রাষ্ট্র-চিকিৎসক' হিসেবে স্বীকার করেছেন। এবং প্রত্যেক ব্যবস্থার বিকারের নিরাময়ের জন্য তিনি নিরাময়পত্র প্রদান করেছেন। কোনো চিকিৎসকই মনে করেন না, তাঁর রোগী অমর কিংবা তাঁর নিরাময়পত্র তার রোগীর রোগকে চিরতরে নির্মূল করবে। এ কেবল রোগীর বেঁচে থাকার প্রয়াসে সাহায্য করা। একই কথা এ্যারিস্টটলের ক্ষেত্রে সত্য। এমন যে স্বৈরতন্ত্র, যে শাসনব্যবস্থা সবচাইতে বেশি রোগগ্রস্ত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আইনবিহীন এবং অনিবার্যভাবে স্বল্পায়ু তার ক্ষেত্রেও এ্যারিস্টটল নিরাময়পত্র প্রদান করেছেন। তাঁর সে নিরাময়পত্র পাঠে পাঠকমাত্রের মনে যেমন কৌতুক রসের সৃষ্টি হয়, তেমনি তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এ্যারিস্টটলের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির পরিচয় প্রকাশ করে। স্বৈরশাসক জ্ঞানীগুণীকে বরদাস্ত করে না। তাদের সকলকে সে নির্বাসিত করে; ঘরে ঘরে সে গুপ্তচর বপন করে; সভা-সম্মেলন অর্থাৎ নাগরিকদের মধ্যে চিন্তার আদান-প্রদানকে নিষিদ্ধ করে এবং নাগরিকদের সর্বদা সে এমন আর্থিক দৈন্যে এবং সর্বগ্রাসী পরিশ্রমে আবদ্ধ রাখে যেন তারা নিজেদের ক্ষুণ্নিবৃত্তির বাইরে শাসন এবং শাসকের বিষয়ে কোনো চিন্তা করতে এবং তাঁর প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম না হয়।

AMARBOI.COM

স্বৈরশাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার দুটি উপায় বা নীতির কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। উপায় দুটি বিভিন্ন। আমি বরঞ্চ প্রথমে সনাতন উপায়টি নিয়েই আলোচনা করব। কারণ, শাসনের এই নীতিটি অধিক সংখ্যক স্বৈরশাসকই অনুসরণ করছে। করিণথ এর পেরিয়ানডার নাকি এর প্রয়োগের বেশ কিছু কৌশল প্রবর্তন করেছিলেন। তবে পারস্য-সরকারের নিকট থেকেও এর অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এখানেই আমরা স্বৈরশাসনকে রক্ষা করার পুরাতন সকল কৌশলের ইঙ্গিত পাই। এদের অন্তর্গত নীতিমালাগুলো হচ্ছে এরূপ : 'মাথাগুলোকে ছেঁটে ফেল এবং স্বাধীনচেতাদের সরিয়ে দাও' এবং সামাজিক বা সাংস্কৃতিক কোনো উপলক্ষে সম্মেলন বা সমিতিতে জনতাকে মিলিত হতে দিও না। কারণ এই স্থানগুলো স্বাধীনচিত্ততা এবং আত্মবিশ্বাসের জন্মকেন্দ্র এবং এ দুটি ব্যাপারেই স্বৈরশাসককে সতর্ক থাকতে হবে। বিদ্যালয় বা শিক্ষালাভের প্রতিষ্ঠানও তৈরি হতে দিও না এবং এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করো যেন প্রজাবৃন্দ পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে জ্ঞাত হতে না পারে। কারণ, পরিচয়ের ভিত্তিতেই তারা আত্মবিশ্বাস তৈরি করে। স্বৈরশাসকের জন্য আর একটি সনাতন উপদেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাও শোনা যায়। এর দ্বারা স্বৈরশাসককে বলা হয় যেন সে নগরবাসীদের সর্বদা নিজের নজরের মধ্যে রাখে এবং তাদের সময়ের সিংহভাগ যেন তারা স্বৈরশাসকের প্রাসাদের দ্বারে অতিবাহিত করে।

...অনুরূপভাবে স্বৈরশাসকের উচিত হবে তার প্রজাবৃন্দ কি বলছে কিংবা করছে তার প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার চেষ্টা করা।...আর একটি সনাতন উপায় হচ্ছে স্বৈরশাসনের সম্ভাব্য সকল বিরোধীর মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দেওয়া। এমন কলহ সৃষ্টির উপায় হচ্ছে বন্ধুর বিরুদ্ধে বন্ধুকে লাগিয়ে দেওয়া, শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীকে এবং এক অর্থবানকে অপর অর্থবানের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা।...স্বৈরশাসকের আর একটি প্রবণতা হচ্ছে যুদ্ধ করার প্রবণতা। যুদ্ধ করার জন্য সর্বদাই সে প্রস্তুত। এর কারণ, যুদ্ধ হলে প্রজাবৃন্দ যুদ্ধের মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং তাদের একজন নেতা আবশ্যক, এই বোধ তাদের আচ্ছন্ন করে রাখে।...স্বৈরশাসকের নীতির একটি অংশ হচ্ছে অপর সকলের চাইতে সুহৃদদের অধিকতর বিপজ্জনক মনে করে তাদের অবিশ্বাস করা।...এগুলি হচ্ছে স্বৈরশাসনের লক্ষণ এবং এভাবেই স্বৈরশাসক বহাল থাকার চেষ্টা করে। এর বাইরেও নানা উপায় আছে এবং সেগুলিও একইভাবে নিন্দনীয়।...

এ্যারিস্টটলের এমন বিশ্লেষণ আধুনিক কালের ক্ষুদ্রবৃহৎ কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকের কাছে কি ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে? কিন্তু বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতার দিক এই যে, এমন রোগীর উদ্দেশে এ্যারিস্টটলের অভিমত হচ্ছে : তোমার অনুসৃত নীতিতে তোমার জীবনকাল অধিকতর হ্রাস বৈ দীর্ঘ হবে না। তার চাইতে বরঞ্চ তুমি কিছুটা মহানুভব হওয়ার চেষ্টা কর; নাগরিকদের সহায়-সম্পত্তিকে এবং মেয়েদের সম্মানকে নিরাপদ করার প্রতিশ্রুতি দাও এবং জীবনযাত্রায় মিতাচারী হওয়ার উদ্যম নাও। তাতে তোমার জীবন-আয়ু কিছুটা দীর্ঘতর হতে পারবে।

স্বৈরতন্ত্রের অনুসৃত নীতিসমূহের যে বিস্তারিত উল্লেখ এ্যারিস্টটল করেছেন তার প্রায় সমকালীন ভারতীয় কূটনীতিজ্ঞ রাষ্ট্রশাসক কৌটিল্যের কথা সহজেই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'র মধ্যেও শাসকের করণীয় সম্পর্কে সুবিস্তারিত নির্দেশ পাওয়া যায়।

যথার্থভাবেই এ্যারিস্টটলের মতো কালজয়ী চিন্তাবিদগণ অমর। আমরা যদিচ তাঁদের দৈহিক মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করি, কিন্তু তাঁদের মৃত্যু ঘটে না। এবং সে কারণে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এ্যারিস্টটলের শাশ্বত সত্যের উল্লেখকালে আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলিনে, 'এ্যারিস্টটল এ কথা বলেছিলেন।' আমরা বলি, 'এ্যারিস্টটল এ কথা বলেন।' আমাদের এরূপ উল্লেখ স্বাভাবিক।

কিন্তু কালজয়ী চরিত্রের আর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা কেবল যে কাল থেকে কাল অতিক্রম করে অগ্রসর হন, তাই নয়। তাঁরা কেবল যে প্রত্যেককালের মানুষকে প্রভাবিত করেন তাই নয়। প্রত্যেক কাল দ্বারা তাঁরা নিজেরাও প্রভাবিত হন। সমাজ-জীবনে সক্রিয় মানুষদের পক্ষে তারা নিজেরাও প্রভাবিত হন। সমাজ-জীবনে সক্রিয় মানুষদের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। তারা পরস্পরের ওপর ক্রিয়াশীল হয়। তারা পরস্পরকে প্রভাবিত করে। এ্যারিস্টটলের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। প্রাচীন গ্রিসে এ্যারিস্টটল একভাবে গৃহীত হয়েছেন। যে-এথেন্সে তিনি নিজের শিক্ষালাভ এবং শিক্ষাদানের জীবন অতিবাহিত করেছেন, নিজের জীবনের আশঙ্কায় সেই এথেন্সকে মৃত্যুর একবছর পূর্বে তাঁকে পরিত্যাগ করে যেতে হয়। ইউরোপের নিরঙ্কুশ ধর্মান্ধতার যুগে বিস্মৃতির হাত থেকে সৃজনশীলভাবে এবং সযত্নে এ্যারিস্টটলকে রক্ষা করেন আরবীয় পণ্ডিতগণ।

পরবর্তীকালে ইউরোপের খ্রিস্টীয় গোঁড়া পাদ্রিকুল যে-এ্যারিস্টটলকে এককালে পরিত্যাজ্য, অপাঠ্য বলে ঘোষণা করেছেন, আর এক যুগে ধর্মীয় সেই পণ্ডিতবর্গ সেই এ্যারিস্টটলের উচ্চারিত সত্যসমূহকে তাঁদের দেয় ব্যাখ্যাসহকারে অলঙ্ঘনীয় বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের ব্যাখ্যাত এ্যারিস্টটলকে কেউ অমান্য এবং অস্বীকার করলে তাকে তাঁরা পাপী বলে অভিযুক্ত এবং বিচার করেছেন। আবার পুনর্জাগরিত ইউরোপের জ্ঞানান্বেষী ব্যক্তিবর্গের নিকট এ্যারিস্টটল জ্ঞানের নতুনতর প্রেরণার উৎস বলে বিবেচিত হয়েছেন। এমনিভাবে এ্যারিস্টটল কাল থেকে কালকে এবং দেশ থেকে দেশকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়ে আমাদের কালে এবং আমাদের দেশে এসে পৌঁছেছেন। এদিক থেকে দেখলে, এ্যারিস্টটলকে অনিঃশেষ বিস্ময়ের এক আকর বলে বোধ হয়। এবং এ কারণেই আজ থেকে প্রায় চব্বিশ শত বছর পূর্বে রচিত এ্যারিস্টটলের 'পলিটিকস' আধুনিক জগতের সকল দেশের জ্ঞানান্বেষীর চিন্তার ক্ষেত্রে নিত্যসঙ্গী হিসেবে বিরাজ করছে।

এ্যারিস্টটল একদিকে যেমন কালজয়ী তেমনি অপরদিকে তিনি তাঁর দেশ ও কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ। তাঁর চিন্তার ক্ষেত্রে এমন উপাদানের সাক্ষাৎ পাওয়া কষ্টকর নয় যে উপাদান তাঁর এই কাল ও দেশ-সম্পর্কের পরিচয়ের চিহ্নে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিহ্নিত। এ্যারিস্টটলের জীবনকাল হচ্ছে মানুষের ঐতিহাসিক জীবনের সেই দেশের সেই কাল যখন তার সমাজের বিকাশ দাসযুগকে পুরোপুরি অতিক্রম করে তার পরবর্তী এবং অধিকতর উন্নতকালে প্রবেশ করেনি। তারই স্বাক্ষর পাওয়া যায় এ্যারিস্টটলের দাসত্বের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনে। এ্যারিস্টটলের সময়ে যে দাসত্বের বিরুদ্ধে অগ্রসর চিন্তাবিদদের সমালোচনামূলক বক্তব্য উপস্থিত হতে শুরু করেনি, তা নয়। কিন্তু এ্যারিস্টটল তাঁর আর্থিক এবং সমাজগত অবস্থানে ছিলেন প্রচলিত সমাজের সমাজপতিদের অন্তর্গত। চিকিৎসকের সন্তান হলেও এ্যারিস্টটল ছিলেন রাজার চিকিৎসকের সন্তান। পণ্ডিত হলেও এ্যারিস্টটল ছিলেন প্রধানত দাসদের শ্রমের ওপর প্রতিষ্ঠিত এথেন্সের শাসন ও সভ্যতারই পণ্ডিত এবং চিন্তাবিদ। তাই এ্যারিস্টটলের নিজের তত্ত্বমতেই প্রতিষ্ঠিত সেই সমাজ ও শাসনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে তার শাসক ও প্রধানদের পক্ষে স্বাভাবিক। এ্যারিস্টটলের মতো পণ্ডিতদের পক্ষে দাসত্বের সমর্থনে যুক্তি প্রদানকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদের দেখা আবশ্যক। দেখা আবশ্যক দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে। এবং এদিক থেকে দেখলে এই দুর্বলতাকে আর অস্বাভাবিক ভাবার কারণ থাকে না।

কালজয়ী চিন্তাবিদ মানে এই নয় যে, কালজয়ী চিন্তাবিদ তাঁর জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তাঁর কালকে জয় করেছেন, তাকে অতিক্রম করেছেন। সর্বক্ষেত্রেই যিনি এরূপ জয় করতে পারেন, তিনি আর মানবিক থাকেন না। মানুষ সেই মানুষকে নিয়েই গর্ববোধ করতে চায় যে-মানুষ নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজের সচেতন চেষ্টায় তাঁর দেশ ও কালের সীমাকে অতিক্রম করে মানুষের অসীম দিগন্ত বিস্তারী বিকাশমান জীবনকে দূরের দৃষ্টি দিয়ে দেখার চেষ্টা করেন। তাঁর এই দৃষ্টিই তার উত্তরপুরুষকে নিজের কালকে অতিক্রম করার চেষ্টায় অনুপ্রাণিত করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্যাকিয়াভেলি

ম্যাকিয়াভেলি (১৪৬৯-১৫২৭ খ্রি.) ছিলেন পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতকের ইতালির জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক এবং চিন্তাবিদ। মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশের ভিত্তিতে ফ্রান্স, স্পেন ও জার্মানিতে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হলেও ইতালি তখনো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ততান্ত্রিক রাজ্য এবং স্বাধীন নগরে বিভক্ত। ইতালির জাতীয় এবং সামাজিক স্বার্থ ইতালিতে ঐক্যবদ্ধ সুশাসিত রাষ্ট্রের গঠন অত্যাবশ্যক করে তুললেও একদিকে রোমের পোপের আপন ক্ষমতা বজায় রাখার ইচ্ছা, অপরদিকে ইতালির রাজ্যসমূহের পারস্পরিক ঈর্ষা ও দ্বন্দ্ব এবং ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের হস্তক্ষেপে ইতালির ঐক্য বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। ইতালির এরূপ পটভূমিতে ম্যাকিয়াভেলির রাজনীতিক জীবন এবং তার রাষ্ট্রীয় দর্শন রূপলাভ করে। ম্যাকিয়াভেলি ১৪৮৮ থেকে ১৫১২ সাল পর্যন্ত ইতালির রাজ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা বাধাহীন ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক শক্তি, যাজকতন্ত্র এবং বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ ম্যাকিয়াভেলির ঐক্য প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে। এই সমস্ত শক্তির স্বার্থে ১৫১২ সালে ফ্লোরেন্স সরকার ম্যাকিয়াভেলিকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে নির্বাসিত করে। এই ঘটনার পরবর্তীকালে ম্যাকিয়াভেলি সক্রিয় রাজনীতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে রাজনীতিক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর রচনার মধ্যে 'ডিসকোর্স' বা আলোচনা এবং 'প্রিন্স' বা রাষ্ট্রনায়ক বিখ্যাত ছিল। 'প্রিন্স' ম্যাকিয়াভেলির মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে প্রকাশিত হয়।

ম্যাকিয়াভেলি ছিলেন উদীয়মান ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ ইতালির সামাজিক ও জাতীয় বিকাশের জন্য জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা তিনি আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। আর ঐক্য সাধনের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার যে বাস্তবনীতি তিনি ব্যাখ্যা করেন 'ম্যাকিয়াভেলির নীতি' বলে তা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ম্যাকিয়াভেলির নীতি বলতে রাষ্ট্রের স্বার্থ সাধনের জন্য বিশেষ কোনো নৈতিকতায় আবদ্ধ না থেকে যা কিছু প্রয়োজন তাই সম্পন্ন করা বোঝায়। ম্যাকিয়াভেলি রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র পরিচালনা উভয়কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্ম এবং নীতির বন্ধন থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্র মানুষেরই সৃষ্টি, কোনো ঐশ্বরিক সত্তা নয়। এবং এর পরিচালনা মানুষের কল্যাণের জন্য। এক্ষেত্রে কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস বা নীতির বন্ধন রাষ্ট্রের জন্য অলঙ্ঘনীয় নয়। রাষ্ট্রের অর্থনীতিক ব্যবস্থার সঙ্গে তার শাসন ব্যবস্থার চরিত্র যে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, এ সত্য ম্যাকিয়াভেলি উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি রাজতন্ত্রকে সর্বাধিক কাম্য শাসন ব্যবস্থা বলেছেন। এর প্রধান কারণ, ইতালির অনৈক্য এবং অরাজকতার অবস্থায় একচ্ছত্র রাজশক্তিকে তিনি প্রয়োজনীয় বোধ করেছিলেন। ইতালিকে শুধু ঐক্যবদ্ধ নয়, তাকে সম্প্রসারিত হতে হবে, বৃহৎ হতে হবে। কারণ ম্যাকিয়াভেলি মনে করতেন, ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও বিকাশ এবং বৃদ্ধিতেই অস্তিত্ব। রাষ্ট্রকে ক্রমান্বয়ে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হতে হবে। অপর রাজ্য গ্রাস করে হলেও তার সীমানাকে সম্প্রসারিত করতে হবে। এই বৃদ্ধিই রাষ্ট্রের জীবন। এই বৃদ্ধি যেখানে স্তব্ধ রাষ্ট্র সেখানে জড় এবং মৃতবৎ। রাষ্ট্রের বিরাট এলাকার ওপর শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং বজায় রাখার জন্য ম্যাকিয়াভেলি কূটকৌশল এবং শক্তিপ্রয়োগের ওপর জোর দেন। ম্যাকিয়াভেলির মতে, উত্তম শাসক সে যে শাসিত অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে ভয় ও সমীহের ভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম। শাসক দয়ালু এবং দুর্বল হলে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা এবং বিদ্রোহের উদ্ভব ঘটে। কাজেই শাসকের পক্ষে প্রশংসিত বা প্রিয় হওয়ার চেয়ে শ্রেয় হচ্ছে ভয়ের পাত্র হওয়া। ম্যাকিয়াভেলির এরূপ বক্তব্য তাঁর সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় ব্যাখ্যার স্থানে ম্যাকিয়াভেলি রাষ্ট্রীয় সমস্যার বিচারে বাস্তব এবং ঐতিহাসিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তাঁর রাজনীতিক সিদ্ধান্তসমূহ একদিকে যেমন তৎকালীন ইতালির ঐক্যসাধন এবং সামাজিক বিকাশ অগ্রসর শক্তির কাজ করেছে তেমনি তার 'নীতিহীনতা' পরবর্তীকালে ইউরোপের ধনবাদী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী এবং ফ্যাসিবাদী আগ্রাসী মনোভাব সৃষ্টিরও সহায়ক হয়েছে। ম্যাকিয়াভেলির বিশেষ অবদান এই যে, এ পর্যন্ত রাষ্ট্রকে যেখানে অতিজাগতিক এবং ঐশ্বরিক সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে সেখানে ম্যাকিয়াভেলি রাষ্ট্র যে মানুষের সৃষ্টি এবং মানুষের প্রয়োজন তার ব্যবহার এবং বিকাশ, এ সত্যকে তিনি মধ্যযুগের পটভূমিতে অগ্রগামীর সাহস নিয়ে প্রকাশ করেছেন।

ম্যাকিয়াভেলির জীবনকালে ইতালি, রোম, ফ্লোরেন্স, মিলান, ভেনিস এবং নেপলস: এরূপ পাঁচটি 'নগর-রাষ্ট্রে' বিভক্ত ছিল। এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ম্যাকিয়াভেলির নিজ রাষ্ট্র ফ্লোরেন্স অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ছিল সবচেয়ে অগ্রগামী, ইউরোপীয় নবজাগরণের অন্যতম কেন্দ্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টমাস হবস

টমাস হবস (১৫৮৮-১৬৭৯ খ্রি.) ছিলেন সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডের বস্তুবাদী দার্শনিক। ইংল্যান্ডে এই সময়ে ধনতান্ত্রিক সমাজ-বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে। ধনতান্ত্রিক বিপ্লবের এই পরিবেশ টমাস হবসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। হবসকে যান্ত্রিক বস্তুবাদের ব্যাখ্যাতা বলা হয়। তার মতে সমগ্র জগত হচ্ছে বস্তুর সমষ্টি। মানুষও বস্তুমাত্র। জগত ও সমাজ, সর্বক্ষেত্রে একটি মাত্র মৌলিক বিধান কার্যরত রয়েছে। সে বিধান হচ্ছে বস্তুর যান্ত্রিক গতি। মানুষ কিংবা অপরাপর জন্তু বস্তুর জটিল গ্রন্থনে সৃষ্ট যন্ত্রবিশেষ। কোনো যন্ত্র যেমন বাইরে থেকে দেওয়া শক্তির জোরে চলতে থাকে, মানুষ এবং জন্তুও বাইরের শক্তি দ্বারা চালিত হচ্ছে। কাজে কাজেই মানুষ বা অপর প্রাণীর মধ্যে দেহের অতিরিক্ত অস্তিত্বসম্পন্ন আত্মা বলে কিছু নেই। বিধাতাকে আত্মার স্রষ্টা বলা হয়। কিন্তু বিধাতা মানুষের কল্পনার সৃষ্টি বৈ কোনো অস্তিত্ব নয়। বস্তু থেকে বস্তুর পার্থক্য কেবল সংখ্যা বা পরিমাণগত

AMARBOI.COM

হবস বিধাতাকে কাল্পনিক বলে বস্তুবাদের পরিপোষক হয়েছেন, কিন্তু বস্তুর গতি বস্তুর বাইরে থেকে আসে মনে করে বস্তুকে আর এক কাল্পনিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল করেছেন। বস্তু যে আপন শক্তিকেই গতিসম্পন্ন, এ ধারণা হবসের ছিল না। জ্ঞানের প্রশ্নে হবস দেকার্তের জন্মগত ভাব বা ধারণাকে অস্বীকার করেন। ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির ভিত্তিতেই মানুষের জ্ঞান তৈরি হয়, অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে বা সহজাত কোনো ভাবের মাধ্যম নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় শাসনের প্রশ্নে হবস রাজার ঐশ্বরিক অধিকারের তত্ত্বকে নাকচ করে সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব সমর্থন করেন। তাঁর মতে, মানুষের সম্মিলিত চুক্তির ভিত্তিতে সমাজ তৈরি হয়েছে এবং রাজাও চুক্তির ভিত্তিতে রাজ্য শাসন করেন। রাজার হাতে চুক্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিত্তিতে অধিকারে সমর্পণ করার পরে নাগরিকের রাজাকে অমান্য করার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না।

একচ্ছত্র রাজতন্ত্র রাজার ইচ্ছামতো প্রতিষ্ঠিত হয় না, সমাজ দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং জনসাধারণের জন্য একমাত্র রাজতন্ত্রই সর্বোত্তম শাসন ব্যবস্থা। কারণ, সমাজের ব্যক্তিমাত্রই স্বভাবগতভাবে স্বার্থপর এবং অপরের অধিকারের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন। এর ফলে শক্তিশালী শাসক ব্যতীত সমাজে অরাজকতা বিরাজ করারই আশঙ্কা। শাসকের শক্তি সীমাবদ্ধ হলে শাসক সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যর্থ হবে। মূলত একচ্ছত্র শাসন সমর্থন করলেও হবস মনে করতেন, ব্যক্তি তার জীবন রক্ষার প্রয়োজনে বিদ্রোহের অধিকারী। হবসের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় তত্ত্বের বিস্তারিত প্রকাশ ঘটেছে 'লেভিয়াথান' নামক তার বিখ্যাত গ্রন্থে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেকার্ত

সপ্তদশ শতকের প্রখ্যাত ফরাসি দার্শনিক ও গণিতশাস্ত্রবিদ বিজ্ঞানী। কর্মজীবনে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০ খ্রি.) প্রথমে স্বদেশের সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত ছিলেন। সামরিক বাহিনীর চাকরি শেষে তিনি সে যুগে সর্বাধিক উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশ হল্যান্ড গমন করেন এবং সেখানে প্রায় বিশ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনি দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চা করেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক মতামতের জন্য হল্যান্ডের গোঁড়া ধর্মযাজকদের হাতে তাঁকে নানা প্রকার নিগ্রহ ভোগ করতে হয়। তাদের নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য দেকার্ত অবশেষে সুইডেনে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সুইডেনেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। জ্যামিতি এবং মেকানিক্স বা বলবিদ্যার ক্ষেত্রে দেকার্ত গতি ও স্থিতির আপেক্ষিক তত্ত্ব এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম আবিষ্কার করেন। সৌরজগতের সৃষ্টি সম্পর্কে বস্তুবাদী মত তখনো অশ্রুত। এ ক্ষেত্রেও দেকার্ত বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দেবার প্রয়াস পান। বস্তুর ব্যাখ্যায় দেকার্ত এরূপ মত পোষণ করতেন যে, বস্তুর মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার স্থানভিত্তিক বিস্তার। বস্তুর বিভিন্ন গুণের মধ্যে বিস্তারের ক্ষেত্রে বস্তু অনন্যনির্ভর। অর্থাৎ বস্তুর স্বাদ, গন্ধ, রঙ ইত্যাকার গুণ মানুষের মনের ওপর নির্ভরশীল হলেও বস্তুর বিস্তার মনের ওপর নির্ভর করে না। দেকার্তের বস্তুবাদ অবিমিশ্র নয়। বস্তুর অস্তিত্ব যেমন তিনি স্বীকার করেছেন, তেমনি বস্তুর গতির প্রশ্নে তিনি ভাববাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে বস্তুর গতির আদি কারণ হচ্ছে ঈশ্বর। ঈশ্বর গতি ও স্থিতি উভয়ই বস্তুর মধ্যে তৈরি করেন এবং গতি ও স্থিতির পরিমাণের অপরিবর্তনীয়তাও তিনি রক্ষা করেন। দেকার্তের এ মতবাদকে দ্বৈতবাদ বলা যায়। মানুষের দেহ এবং মনের ব্যাখ্যায়ও দেকার্ত দ্বৈতবাদী। মানুষ হচ্ছে দেহ এবং মনের সম্মিলিত সংগঠন। দেহ হচ্ছে মনহীন বস্তু আর মন হচ্ছে বস্তুহীন সত্তা। দেহ আর মন চরিত্রগতভাবে পরস্পরবিরোধী। এই দুই বিরোধী সত্তা পাইনিয়াল গ্ল্যান্ড নামক একটি তন্ত্রীর মাধ্যমে মিলিত হয়ে পারস্পরিক ক্রিয়া-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়। বেকনের ন্যায় দেকার্তও প্রকৃতির কার্যকারণ জ্ঞাত হয়ে প্রকৃতিকে জয় করা এবং মানুষের চরিত্রকে উন্নত করাই জ্ঞানের উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন। সঠিক জ্ঞান লাভের কি পদ্ধতি হবে? এর জবাবে দেকার্ত তাঁর বিখ্যাত সন্দেহবাদের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, সুনিশ্চিত জ্ঞানলাভের জন্য এমন একটি ভিত্তি থেকে শুরু করতে হবে, যে-ভিত্তি সর্বপ্রকার সন্দেহের ঊর্ধ্বে। যে সূত্র সন্দেহযোগ্য তার মাধ্যমে সুনিশ্চিত জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে দেকার্ত প্রচলিত সমস্ত সূত্রের ওপর সন্দেহ পোষণ করতে করতে আমার নিজের অস্তিত্ব সন্দেহের ঊর্ধ্বে বা 'কজিটো আরগোসাম'–এই সিদ্ধান্তে আসেন। ব্যক্তি সবকিছুতেই সন্দেহ করতে পারে, কিন্তু সে নিজের অস্তিত্বকে সন্দেহ করতে পারে না। এ তত্ত্বের একটি অজ্ঞেয়বাদী তাৎপর্য আছে। কিন্তু দেকার্তে অজ্ঞেয়বাদী না হয়ে নিজের তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, নিজের অস্তিত্ব সন্দেহাতীত, এই সূত্রকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করে আমরা জগতের সুনিশ্চিত জ্ঞানমণ্ডল আবার তৈরি করতে পারি। দেকার্তের এই জ্ঞানতত্ত্ব সাধারণত র‍্যাশনালিজম বা যুক্তিতত্ত্ব নামে পরিচিত। তাঁর মতে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিজের অস্তিত্বের মতো আরো কতকগুলি জন্মগত সুনিশ্চিত সূত্র মানুষের আছে। এই সুনিশ্চিত সূত্রগুলির ভিত্তিতেই মানুষের জ্ঞানমণ্ডলের প্রতিষ্ঠা। জন্মগত সুনিশ্চিত সূত্রগুলি ঈশ্বর মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে দেন। ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে এ সূত্রগুলি সন্দেহাতীত এবং সন্দেহাতীত সূত্রের ভিত্তিতে যুক্তি পরম্পরায় লব্ধ যে কোনো জ্ঞান সঠিক হতে বাধ্য। দেকার্ত তাঁর দর্শনে ও চিন্তায় যথার্থই দ্বৈতবাদী ছিলেন। এ কারণে একদিকে বস্তুবাদী মত দ্বারা তিনি যেমন গোঁড়ামির বেড়াজাল ভেঙে চিন্তার মুক্তিকে সাহায্য করেছেন, তেমনি অপরদিকে অতি-প্রাকৃতিক অস্তিত্বের মূল স্থাপন করে তিনি ইউরোপের আধুনিক দর্শনে ভাববাদী ধারাও প্রবর্তন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন লক

জন লক (১৬৩২-১৭০৪ খ্রি.) ছিলেন সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডের বঙ্গবাদী দার্শনিক, অর্থনীতিক এবং রাজনৈতিক লেখক। তখনকার ইংল্যান্ডের রাজনীতিক এবং সমাজজীবন যে শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রভাবে সংঘটিত হচ্ছিল, লক তাতে প্রত্যক্ষভাবেই অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর প্রধান দার্শনিক রচনা হচ্ছে 'এসে কনসারনিং হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং' বা মানুষের জ্ঞান সম্পর্কিত নিবন্ধ। এর প্রকাশকাল ১৬৯০। এই নিবন্ধ লক তাঁর বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাবাদ—এর জ্ঞানতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লক দেকার্তের জন্মগত ভাব-এর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। লকের মতে, অভিজ্ঞতাপূর্ব বা জন্মগত কোনো ভাবের অস্তিত্ব নেই। মানুষের মনের সব ভাবেরই মূল হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতা। ভাব দুপ্রকার হতে পারে। মৌল এবং অ-মৌল বস্তুজগত সর্বক্ষণ মানুষের ইন্দ্রিয়ের ওপর আঘাত হানছে। এই আঘাতের মাধ্যমে মনের মধ্যে ইন্দ্রিয়গত ভাবের উদ্ভব ঘটে। ব্যক্তি অবশ্য তার নিজের মানসিক ক্রিয়াকলাপের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কিছু মনোজগত ভাবেরও সৃষ্টি করতে পারে। 'মনোগত ভাবের' স্বীকৃতি দ্বারা লক জ্ঞানের প্রশ্নে ভাববাদী তত্ত্বের সঙ্গে খানিকটা আপোষ করতে বাধ্য হয়েছেন। এর ফলে জ্ঞানের তত্ত্বে লককে অবিমিশ্র বাস্তব অভিজ্ঞতাবাদী বা ইন্দ্রিয়গত ভাববাদী বলে বিবেচনা করা চলে না। লকের মতে, ইন্দিয়গত ভাব দ্বারা আমরা বস্তুর মৌলিক এবং অ-মৌলিক গুণের জ্ঞান লাভ করি। 'শক্তত্ব' বস্তুর একটি মৌলিক গুণ। কিন্তু তার রং একটি অ-মৌলিক গুণ। ভাবমাত্রই জ্ঞান নয়। বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতা থেকে ইন্দ্রিয় যে ভাব সংগ্রহ করে তা জ্ঞানের কাঁচামালবিশেষ। এই কাঁচামালের ওপর মনের তুলনা, বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জ্ঞানের সৃষ্টি। এই প্রক্রিয়াতেই মন সহজ থেকে জটিল ভাবের সৃষ্টি করে। মানুষের মনে জন্মগত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো ভাব থাকে না। কারণ শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তার মন একখানি নিদাগ শ্লেট বা 'টেবুলা রাসা' ব্যতীত আর কিছুই নয়। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বস্তুজগত শিশুর ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে এই নিদাগ শ্লেটে অসংখ্যা দাগ কেটে দিতে থাকে। নিদাগ শ্লেটে বস্তুজগতের এই দাগই হচ্ছে ভাব বা জ্ঞানের কাঁচামাল।

মানুষের জ্ঞানের ক্ষমতা কতখানি, এটি দর্শনের একটি বিতর্কিত প্রশ্ন। লক জনের সীমানাকে অসীম বলেননি। বস্তুজগত এবং বিশেষ করে অবস্তুজগতের অনেক কিছুই মানুষ হয়তো জানতে পারে না। কিন্তু তাই বলে মানুষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসহায় নয়। লক জ্ঞানের সীমাকে স্বীকার করলেও তিনি অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন না। তাঁর কাছে জ্ঞানের মূল প্রশ্ন হচ্ছে, জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন। এরূপ জ্ঞানলাভের ক্ষমতা মানুষের অবশ্যই আছে।

রাষ্ট্রীয় তত্ত্বে লক মানুষের আদিম অবস্থা থেকে সভ্যতায় উত্তরণের স্তরসমূহের ওপর আলোকপাত করেন এবং সরকারের প্রকারভেদ সম্পর্কেও আলোচনা করেন। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নটি সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডের ধনিক শ্রেণীর কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল। ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের ধনিক শ্রেণী আপন বিকাশের জন্য একটি সামাজিক বিপ্লব সাধন করে। তাদের কাছে রাষ্ট্রের ভূমিকা নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং তাদের সম্পদের নিরাপত্তা বিধানের মধ্যে নিহিত থাকবে। সরকারের কর্তব্য হবে ব্যক্তিত্বের অধিকার রক্ষা করা। অধিকার হরণ করা নয়। এই ভূমিকাকে লঙ্ঘন করে রাষ্ট্র বা সরকার স্বৈরাচারী রূপধারণ করলে নাগরিকেরও অধিকার থাকবে সে সরকার বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার সামাজিক ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটাবার। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং দার্শনিক প্রশ্নসমূহের প্রগতিশীল এবং বাস্তববাদী সমাধানে লকের চিন্তাধারার প্রভাব তৎকালে সুদূরপ্রসারী ছিল। পরবর্তীকালে ফরাসি দেশে যে বস্তুবাদী দর্শন বিকাশ লাভ করেছিল তার প্রেরণার উৎস ছিল লকের ভাবধারা। লক বস্তুর মৌলিক এবং অ-মৌলিক এবং গুণের মধ্যে যে পার্থক্য স্বীকার করেছিলেন তাঁর সে পার্থক্যের ভিত্তিতেই আবার ভাববাদী দার্শনিক ধর্মযাজক বার্কলে জ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তির মানসিক বোধে পর্যবসিত করার প্রয়াস পান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পিনোজা

স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭ খ্রি.) ছিলেন সপ্তদশ শতকের ইউরোপের বিখ্যাত বস্তুবাদী দার্শনিক। হল্যান্ডে তাঁর জন্ম। স্পিনোজার মুক্ত চিন্তার জন্য আমস্টারডামের ইহুদি সম্প্রদায় স্পিনোজাকে সমাজচ্যুত করেছিল। দর্শনে জ্যামিতিক পদ্ধতির প্রবর্তন করেন স্পিনোজা। স্পেনের সামন্তবাদী রাজতন্ত্রের আধিপত্য থেকে মুক্তিলাভ করার পরে হল্যান্ডেই ইউরোপের প্রথম পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ ঘটে। এই পরিবেশে স্পিনোজার দর্শন আত্মপ্রকাশ করে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বপথিক বেকন এবং দেকার্তের মতো স্পিনোজাও এই অভিমত পোষণ করতেন যে, জ্ঞানের লক্ষ্য হবে, মানুষকে প্রকৃতির প্রভুতে পরিণত করা এবং মানুষের সার্বিক উন্নতি সাধন করা। তাছাড়া স্পিনোজা মানুষের কর্মের স্বাধীনতার তত্ত্বও প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাকৃতিক বিধান সত্য। প্রাকৃতিক বিধান মানুষ আবিষ্কার করবে। প্রাকৃতিক বিধান মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু তথাপি বিধানের এ অপরিবার্যতার মধ্যে মানুষ শুধুমাত্র ক্রীড়নক নয়। মানুষের কর্মের আপেক্ষিক স্বাধীনতা আছে। মানুষের স্বাধীনতার এই তত্ত্ব প্রসঙ্গে জগত সম্পর্কে স্পিনোজা নিজের দর্শন ব্যাখ্যা করেন। জগত এবং বিধাতা–সত্তার এরূপ কোনো দ্বিধাবিভক্ত স্পিনোজা স্বীকার করেন না। জগতই অর্থাৎ বস্তু জগত-ই একমাত্র সত্তা, জগত নিজেই নিজের কারণ এবং সৃষ্টি। জগত সৃষ্টির জন্য আদি কারণের তত্ত্ব অপ্রয়োজনীয়। জগতের মধ্যেই জগতের সৃষ্টির কারণ বিদ্যমান। জগত স্বতঃসৃষ্টিশীল সত্তা। সত্তার বস্তুবাদী ব্যাখ্যা সত্ত্বেও স্পিনোজা জ্ঞানের প্রশ্নে ছিলেন দেকার্তের অনুসারী এবং প্রজ্ঞাবাদী। তাঁর কাছে অভিজ্ঞতাগত বা ইন্দ্রিগত জ্ঞান সীমাবদ্ধ। বুদ্ধি এবং বিশেষ করে প্রজ্ঞা বা সজ্ঞাগত জ্ঞানই সমস্ত সংশয়োর্ধ্ব জ্ঞান। সত্যকে কেবল প্রত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। দেকার্তের মতো, স্পিনোজাও মনে করতেন যে, সংশয়হীন সত্যই চরম সত্য। আর সংশয়হীন সত্য কেবল প্রজ্ঞার মারফতেই লাভ করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। স্পিনোজার ধর্ম সম্পর্কিত অভিমতও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, ধর্মের কাজ হবে মানুষের চরিত্রকে উন্নত করে তোলা। জীবন, জগত, সমাজ, ঈশ্বর সব সমস্যার ক্ষেত্রে মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করবে। ধর্ম বা রাষ্ট্রীয় যন্ত্র—কারো অধিকার নেই ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তায় হস্তক্ষেপ করার, কিংবা তাকে নিয়ন্ত্রিত করার। রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্পিনোজা ছিলেন গণতন্ত্রের সমর্থক। গণতান্ত্রিক সরকারই রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি। এই সার্বভৌম শক্তির নিয়ন্ত্রণ আসবে ব্যক্তির মতামতের স্বাধীনতার মাধ্যমে।

ধর্ম, বিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রীয় সমস্যার ক্ষেত্রে স্পিনোজার এরূপ মুক্তচিন্তা সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকের বস্তুবাদী, প্রগতিশীল চিন্তাধারার পরিবর্তনে বিশেষ সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস স্পিনোজার চিন্তাধারাকে তাঁর যুগ এবং পরবর্তীকালের বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছিলেন। স্পিনোজার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এঙ্গেলস এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, স্পিনোজা থেকে ফরাসি বস্তুবাদ পর্যন্ত বিস্তারিত যুগের চিন্তাবিদদের গুরুত্ব এখানে যে, তাঁরা জগতকে জগত দ্বারাই ব্যখ্যা করেছেন—জগত বহির্ভূত কোনো শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেননি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাঁ জ্যাক রুশো

অষ্টাদশ শতকের ফরাসি মুক্তবুদ্ধি-পথিকৃৎদের অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন জাঁ জ্যাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮ (খ্রি.পূ.)। দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিদ, সৌন্দর্যতত্ত্ববিদ এবং শিক্ষণের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক হিসেবে রুশো খ্যাতি অর্জন করেন। অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে, একদল বিশ্বকোষিক সঙ্ঘবদ্ধভাবে কুসংস্কার এবং প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে মুক্তবুদ্ধির চর্চা করেন। এঁদের মধ্যে ডিডেরট, ডি এ্যালেম্বার্ট, মন্টেসক্যু, ভলটেয়ার, হেলভেটিয়াস এবং হলবাকের সঙ্গে রুশোর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের রচনাবলী ভাবগতভাবে ফরাসি বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

রুশো জন্মগ্রহণ করেন সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে। তাঁর পিতা ছিলেন একজন দরিদ্র ঘড়ি নির্মাতা। ১৭৪২ সালে রুশো ৩০ বছর বয়সে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস গমন করেন। নিজের জীবনধারণের জন্য শৈশবকাল থেকে রুশো বিচিত্র জীবিকা অবলম্বন করেন। এভাবে তিনি জীবনে বিপুল অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হন। প্যারিসে আসার পরে দিজন একাডেমী ঘোষিত একটি রচনা প্রতিযোগিতার প্রতি রুশোর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় (১৭৪৯)। একাডেমী ঘোষিত প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং শিল্প কি মানুষের জীবনকে উন্নত করছে, না তাকে অধিকতর কলুষময় করছে? রুশো এই প্রতিযোগিতার জন্য একটি প্রবন্ধ পেশ করেন। তাঁর এই প্রবন্ধ একাডেমী কর্তৃক সর্বোত্তম বিবেচিত হয় এবং তাঁকে প্রথম পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। তাঁর এই রচনাতেই রুশোর রাষ্ট্র এবং সমাজদর্শনের মূল দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। প্রচলিত চিন্তাধারার বিরুদ্ধতা করে রুশো তার এই প্রবন্ধেই দেখাতে চেষ্টা করেন যে, তথাকথিত সভ্যতার পূর্ব-যুগেই মানুষ অধিকতর স্বাভাবিক এবং যথার্থ মানুষ ছিল। সভ্য মানুষের শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, তার অন্তরের পরশ্রীকাতরতা, সন্দেহ, ভয়, হৃদয়হীনতা, আত্মম্ভরিতা, ঘৃণা এবং প্রতারণাকে আড়াল করে রাখার আচ্ছাদন বৈ আর কিছু নয়। রুশোর মতে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাস সভ্যতা যতো অগ্রসর হয়েছে মানুষের জীবন ততো কৃত্রিম এবং জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সভ্যতার পূর্বেই মানুষ সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। রুশোর এই অভিমতের অধিকতর যুক্তিসহ সুবিস্তারিত প্রকাশ ঘটে তাঁর ১৭৬২ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ 'দি সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট' বা 'সামাজিক চুক্তি'র মধ্যে। লক এবং হবসের ন্যায় রুশোও এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, রাষ্ট্রের সংগঠনের পূর্বে মানুষ একটা প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করত। এই প্রাকৃতিক পরিবেশ বা অবস্থা সম্পর্কে হবস মনে করতেন যে, প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ সর্বক্ষণ আত্মঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। কারণ মানুষ প্রধানত আত্মকেন্দ্রিক, আত্মসুখান্বেষী এবং পরদ্বেষী। কিন্তু আত্মঘাতী শক্তির কাছে নিজেদের ব্যক্তিগত অধিকার সমর্পণ করে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং শাসকের বিধান মতো জীবনযাপন না করলে ব্যক্তির পক্ষে নিরাপদ জীবনযাপন সম্ভব নয়। এই চেতনা থেকে মানুষ একসঙ্গে চুক্তির মারফত শাসক সৃষ্টি করে নিয়মবদ্ধ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। রুশোও একথা স্বীকার করেন যে, মানুষ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু প্রাকৃতিক অবস্থার রূপ এবং চুক্তির প্রকার সম্পর্কে রুশো হবস থেকে পৃথক মত পোষণ করেন। রুশোর মতে, মানুষের চরিত্র মূলত স্বার্থপর নয়। প্রাকৃতিক অবস্থাতে মানুষ পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল জীবই ছিল। অপরের প্রতি সহানুভূতিবোধ করা মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার এই বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে। লকের মতোই একদিকে যেমন রুশো প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের চরিত্রকে একেবারে আদর্শ হিসেবে কল্পনা করেননি, তেমনি হবসের ন্যায় তিনি মানুষকে অধমও ভাবেননি। রুশোর মতে, মানুষ প্রাকৃতিক অবস্থায় সাধারণ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে চাইত। কিন্তু একটা পর্যায়ে সে দেখতে পেল যে, বক্তির একার পক্ষে অপরের সঙ্গে সংযোগহীনভাবে প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে নিরাপদ জীবনযাপন করা এবং নিজের অধিকারসমূহ প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এই বোধ থেকে মানুষ চুক্তি করে রাষ্ট্র অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুন, বিধিনিষেধের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এ চুক্তি সে অপর কোনো শাসক বা অধিনায়কের সঙ্গে করেনি কিংবা চুক্তি মারফত কোনো নিরঙ্কুশ একচ্ছত্র শাসককে সে তৈরি করেনি। ব্যক্তি চুক্তি করেছে ব্যক্তির সঙ্গে অর্থাৎ প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে। চুক্তির মূল কথা হচ্ছে, একে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে না। এমনিভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের (নিজের সঙ্গে নিজের) চুক্তিতে সৃষ্ট হয়েছে এক সাধারণ ইচ্ছা বা সাধারণ শক্তি। এই সাধারণ ইচ্ছাই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষের নিয়ামক। এ ইচ্ছা কোনো ব্যক্তিরই যথার্থ স্বার্থের বৈরী নয়। প্রত্যেকের ইচ্ছা দিয়ে এর সৃষ্টি বলে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই যেমন এই সাধারণ ইচ্ছাকে জবরদস্তি মনে করা চলে না—তেমনি এই সাধারণ ইচ্ছা শক্তির যথার্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বার্থের বিরোধী কোনো নিয়ম বা নিষেধ আকারেও প্রকাশিত হতে পারে না। রুশোর মতে, সামাজিক চুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের একটা পর্যায়ে অর্থাৎ প্রাকৃতিক জীবনে মানুষ যে স্বাধিকার ভোগ করত, সভ্যতার পর্যায়েও যৌথ-সম্মতির ভিত্তিতে মানুষ যেন নিরাপদভাবে সেই অধিকার ভোগ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা। হবস এবং রুশোর চুক্তির মধ্যে একটা সাদৃশ্য এই যে, উভয় ক্ষেত্রে মানুষ তার চুক্তি-পূর্ব ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সর্বতোভাবে অপর এক শক্তির কাছে সমর্পণ করে দিচ্ছে। কিন্তু হবসের তত্ত্বে ব্যক্তি যেখানে একচ্ছত্র শাসকের নিকট শর্তহীনভাবে তার স্বাধীনতাকে ত্যাগ করেছে সেখানে রুশোর মতে শৃঙ্খলিত বন্দিও তো বন্দিশালায় নিরাপদ শান্তি লাভ করতে পারে। কিন্তু তাই বলে সে শান্তি কি মানুষের কাম্য হতে পারে? কাজেই সামাজিক চুক্তি ব্যক্তির অধিকার বিনষ্টের জন্য নয়, তা রক্ষার জন্য। রুশোর মতে, মানুষ পারস্পরিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এই চেতনা থেকে যে এককভাবে তার অধিকার ভোগ করা সম্ভব নয়। এই চেতনা থেকে সকলে সকলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এ চুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তি তার কোনো যথার্থ স্বার্থ থেকে বঞ্চিত হয়নি। কারণ চুক্তিবদ্ধ এক ব্যক্তি এমন কোনো অধিকার অপর ব্যক্তিকে অর্পণ করে দিচ্ছে না যার পরিবর্তে ঠিক সেই অধিকারই সে অপরের নিকট থেকেও লাভ করছে না।

দর্শনের ক্ষেত্রে রুশো ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং আত্মার অমরতা উভয়কেই স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু আবার বস্তুকেও তিনি শাশ্বত বলেছেন। সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে রুশো সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচক ছিলেন। সামন্ততন্ত্রের শোষণ ও শ্রেণীবিন্যাসের উচ্ছেদ করে সকল মানুষের সমান অধিকারের ভিত্তিতে নতুন যে বিপ্লবীচেতনা দেশের ধনিক শ্রেণী ও কৃষক সমাজের মধ্যে বিস্তার লাভ করছিল বুর্জোয়া বিপ্লবের সে চিন্তাধারাকে রুশো সমর্থন করেছিলেন। সমাজের অসাম্য ও অবিচারের মূল ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্বকে প্রধান হিসেবে চিহ্নিত করলেও রুশো ব্যক্তির জন্য অল্প পরিমাণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার মতও পোষণ করতেন। শিক্ষার প্রশ্নেও রুশো প্রগতিশীল অভিমত পোষণ করতেন। তাঁর মতে সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষার পরিবর্তে এমন এক শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে, যে শিক্ষা সকল নাগরিককে শ্রমের মর্যাদায় উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হবে।

রুশোর বিপ্লবী চিন্তায় ফরাসি সরকার এবং সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল-শক্তিসমূহ রুষ্ট হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রীয় নিগ্রহের আশঙ্কায় তিনি এক সময়ে ফ্রান্স পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে বার্ন প্রজাতন্ত্র তাঁকে আশ্রয় দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্বীকার করায় তিনি ইংরেজ দার্শনিক হিউমের আমন্ত্রণে ইংল্যান্ড গমন করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে হিউমের সঙ্গে তার মতদ্বৈধ উপস্থিত হয় এবং তিনি ফ্রান্সেই প্রত্যাবর্তন করেন।

–রুশোর রচনাবলীর মধ্যে 'দি সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট' বা 'সামাজিক চুক্তি' ব্যতীত তাঁর 'কনফেশনস' বা আত্মচরিত এবং ডিডেরটের সম্পাদনায় প্রকাশিত ফরাসি বিশ্বকোষে প্রকাশিত 'ডিসকোর্স অন পলিটিক্যাল ইকনমি' এবং 'এমিলি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দুই

১৭১২ খ্রিস্টাব্দে যার জন্ম এবং ফরাসি বিপ্লবের এগারো বছর পূর্বে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে যার মৃত্যু : অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই রুশো সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত আবেগমূলক অনুভূতির কিছু প্রকাশ আমি বর্তমান অনুবাদের প্রথমে স্থাপন করেছি। আমি বলেছি : 'আমার প্রিয় রুশো'।

জীবনের রাস্তাঘাটের অভিজ্ঞতায় শিক্ষিত রুশো। সে জীবন কোনো সরলরেখার জীবন নয়। আমরা অভিভূত রুশোর জীবনের অত্যদ্ভুত সব অক্র-বক্র পরিবর্তনে। সম্পদ এবং স্বাভাবিক পারিবারিক জীবনের স্নেহ-মমতা বর্জিত, জীবনের সড়কে নির্দয়ভাব নিক্ষিপ্ত একটি কিশোর কালক্রমে 'জাঁ জ্যাক রুশোতে', ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম সড়ক নির্মাণকারীতে পরিণত হয়েছিলেন। কেমন করে হয়েছিলেন, এ যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসিদেশ তথা ইউরোপের এক বিস্ময়, তেমনি তার রচনাবলীকে পাঠ করে সহজবোধ্য বলে মনে করাও কঠিন।

সমাজ, রাষ্ট্র, জীবন সম্পর্কে পণ্ডিতজনদের তত্ত্বমূলক রচনা তাদের জীবনকে না জেনেও আমরা পাঠ করতে পারি, তাকে আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু রুশো সম্পর্কে একথা সত্য নয়। রুশোকে না জেনে রুশোর গ্রন্থ পাঠ করে বোঝা সহজ নয়। রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের ক্ষেত্রেও তাই। রুশোর জীবনকে ক্রমাধিকভাবে জেনেই মাত্র রুশোকে আমরা ক্রমাধিকভাবে বুঝতে পারি। এবং তখন যতো বুঝি ততো আজীবন কিশোর এই লোকটিকে একজন নিকটলোক বলে বোধ হয়। কোনো অভিজাত নয়, কোনো পণ্ডিত নয়। জীবনের একজন একনিষ্ঠ প্রেমিক এবং পরিব্রাজক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক সম্মোহনকারী রূপের অধিকারী রুশোর সখীর কোনো অভাব ছিল না। তাদের সঙ্গে তার সম্পর্কও ছিল যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, তেমনি কৌতূহলজনক এবং সদা-চঞ্চল। এমনি এক সখী তার রচনার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেছিল : 'তোমার কথা স্ববিরোধিতায় ভরা। তুমি এই বলছ স্বাধীনতা, আবার বলছ অধীনতা; এই বলছ সাধারণ ইচ্ছা, আবার বলছ বিশেষ ইচ্ছা, এই বলছ ব্যক্তি সার্বভৌমত্ব, সামগ্রিক এবং অবিভাজ্য, অবিচ্ছেদ্য, আবার বলছ, ব্যক্তি যদি নিজের সত্যকারের স্বাধীনতাকে অনুধাবন করতে অক্ষম হয় তবে তাকে জোর করে হলেও তার যথার্থ স্বাধীনতাকে রক্ষা করে দিতে হবে; 'দি ইনডিভিজুয়াল হ্যাস টু বি ফোর্সড্ টু বি ফ্রিড'। রুশো তোমার এমন স্ববিরোধী কথা বোঝা ভার।' রুশো তার জবাবে নাকি বলেছিল, 'সখী অত সহজে রুশোকে বোঝা যাবে না।' 'রুশোর অভিধান' বলে একটি অভিধান আছে, সে অভিধানকে তোমার আগে পাঠ করতে হবে।'

রুশোর এমন যুক্তিরও জবাবদান আমাদের পক্ষে কঠিন। কারণ যাকে আমরা জীবন বলি সে জীবনও কোনো সরলরেখা নয়। পরস্পরবিরোধী ঘটনা এবং সত্য দিয়েই সে জীবন তৈরি।

AMARBOI.COM

একজন প্রখ্যাত সমাজবিদ বলেছেন : রুশোর মধ্যে আমরা সমাজতান্ত্রিক চিন্তারও পরিচয় পাই। কিন্তু তাকে নির্ভেজাল সমাজতন্ত্রী বলে চিহ্নিত করতে পারিনে। সমাজের ক্ষেত্রে আদিতে ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধের মধ্যে যেমন রুশো সমাজের অসাম্যের উদ্ভব দেখেছেন, তেমনি আবার সম্পদকে তথা ব্যক্তিগত সম্পদের প্রয়োজনকে বিবর্তিত সমাজ-জীবনে রুশো অস্বীকারও করেননি। তার ভাষায় : 'ব্যক্তিগত সম্পদের প্রয়োজন আছে। তাই বলে সম্পদবানের সম্পদ যেন এতো বিপুল না হয় যে, তার সম্পদ দিয়ে সে ব্যক্তিকে ক্রয় করে তাকে দাস বানাতে সক্ষম হয় এবং দারিদ্র্যও যেন এমন দারিদ্র্য না হয়, যে দারিদ্র্য দরিদ্রকে অপরের নিকট নিজেকে দাস হিসেবে বিক্রয় করে দিতে বাধ্য করে।'

এমন লোকই বলতে পারে : 'শেষ বিচারের দিন আমি বিধাতাকে বলব : আমি ভালো কিংবা মন্দ তা আমি জানিনে। কিন্তু আমি অনন্য। কারণ প্রকৃতি আমাকে যে ছাঁচটিতে তৈরি করেছিল, সে ছাঁচটি আমাকে তৈরি করার পরে সে ভেঙে ফেলেছে!'...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব কথা এই মুখবন্ধে বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়। শুধু এজন্যেই এর উত্থাপন যে, রুশোর 'সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট' পাঠ করার ক্ষেত্রে রুশোর এসব কথা তথা তার জীবনকে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে।

তিন

আমি এখনো রুশোর ভূতগ্রস্ত : রুশোর ভূতে পাওয়া। কেমন করে যে কয়েক বছর পূর্বে রুশোর ভূত আমাকে আছর করেছিল তা আমি আজও বুঝতে পারছিনে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, সেই আছরের আচ্ছন্নতায় প্রায় পাঁচ বছর আগে তার সোশ্যাল কন্ট্রাক্টকে বাংলায় নিয়ে আসার কাজ আমি শুরু করেছিলাম। আমাদের বাংলাদেশেই আমার আর এক বন্ধু অধ্যাপক নূর মোহাম্মদ মিঞা 'সমাজ-সংঘর্ষ' নামে রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের একটি অনুবাদ তৈরি করেছিলেন। সে অনুবাদখানি বেশ কয়েক বছর আগে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

তা সত্ত্বেও আমি রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট '৯৮-৯৯ সালের দিকে আমার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বাংলায় রূপান্তরিত করতে শুরু করি। এবং প্রখ্যাত শৈলী পাক্ষিক সাহিত্য পত্রিকাটিতে যেমন এক বছরের অধিককাল ধরে ধারাবাহিকভাবে অনুবাদটি প্রকাশিত হতে থাকে, পরবর্তী সময়ে মাওলা ব্রাদার্স : প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে রুশোর 'সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট' নামে অনুবাদটি পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়।

ভেবেছিলাম তারপরে আর রুশোর গায়ে হাত দেব না। কিন্তু তা সম্ভব হলো না। রুশোর 'দি কনফেশনস' আমাকে রুশো-মুক্ত হতে দিল না। কিন্তু রুশোর গায়ে হাত দিতে সাহস পাচ্ছিলাম না। রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট অনুবাদ করেও যে রুশোকে বাংলাদেশের তরুণ-তরুণী, তথা আমাদের নতুন প্রজন্ম পাঠকদের কাছে তেমন পৌঁছতে পেরেছি, তা মনে করিনে। রুশোর নিজের ভাষাতেই এরূপ উক্তি আছে : 'আমাকে বোঝা অত সহজ নয়।' একথা আমি যেন কিছুটা বুঝতে পেরেছি এবং পারছি। তবু রুশোকে ছাড়তে পারছিনে।

এটি কম কথা নয় যে, ২০০৩ সালের আজকের ১৮ জুলাই তারিখে ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত পকেট লাইব্রেরির সেই কনফেশন অব জাঁ জ্যাক রুশোকে আবার ডায়েরির পাতায় আমার ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র হস্তাক্ষরে রূপান্তর করার ভূতগ্রস্ত প্রয়াস এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়ে দেখলাম : আমার নিজের পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা সংখ্যায় ১০০ অতিক্রম করেছে এবং সামনের পৃষ্ঠাটিতে প্রথম পুস্তকের অন্তে দ্বিতীয় পুস্তকের শিরোনামটি ভেসে উঠেছে। এতদূর আসতে পারব, এমন আমি আশা করিনি। তাই এটি আমার চিন্তার অতীত। প্রায় ঝরে-পড়া নিউজপ্রিন্টের কাগজের এই কপিটি। এর প্রথম পৃষ্ঠায় উৎকীর্ণ অক্ষরে দেখা যাচ্ছে বইটি আমি সংগ্রহ করেছিলাম : আজ থেকে ৪০ বছর পূর্বে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে তখনকার নিউমার্কেটের একটি বইয়ের দোকান থেকে।

'পকেট লাইব্রেরি : নিউইয়র্ক' প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে। পুস্তক পরিচয়ে প্রকাশক পকেট লাইব্রেরি বলেছিল : দি কনফেশনস-এর এই ইংরেজি অনুবাদটি নামহীনভাবে একজন অনুবাদকের স্বাক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে : রুশোর মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে। পকেট লাইব্রেরির এই সংস্করণটির সম্পাদনা করেছেন বাল্টিমোরের গাওচার কলেজের লেস্টার জি. ক্রোকার : (Lester G. Crocker.)

রুশোর 'দি কনফেশনস'কে আমি বাংলায় অভিহিত করেছি : 'আমি রুশো বলছি' হিসেবে। আমি ফরাসি ভাষা জানিনে। ইংরেজি যাও একটু জানতাম তাও বাংলাদেশের নব্য-মার্কিনিরা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। আমার 'জীবনের চল্লিশ কি পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবেশে যা একটু আগ্রহ করেছিলাম তাও পাছে একেবারে স্মৃতির পট থেকে মুছে যায় সেই আশঙ্কায় এখন 'আমি রুশো বলছি' বলে রুশোর গায়ে হাত রেখেছি।

এই কর্মে আমার প্রধান ভিত্তি হয়েছে পকেট লাইব্রেরি নামক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে, লেস্টার জি ক্রোকার-এর সম্পাদিত 'দি কনফেশনস অব জা জ্যাঁক রুশো' নামে প্রকাশিত গ্রন্থখানি। আমার ভাগ্য ভালো। এই গ্রন্থ আমি সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগের : আজ ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের চল্লিশ বছর পূর্বে।

'আমি রুশো বলছি' এই নামে বর্তমান প্রচেষ্টায় আমি রুশোকে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছি। রুশোর কোনো আক্ষরিক বা অনাক্ষরিক অনুবাদ নয়, বলতে পারি মর্মানুবাদ। মর্মকে নিয়ে আসাই বড় কর্ম। অনুবাদ নয়। যে রুশো আমার কাছে এখনো মৃত নয়, বিস্মৃত নয় এবং বোধের দিক থেকে অপ্রয়োজনীয় নয়, তেমন এক জীবিত রুশোকে আমার প্রিয় বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠকবৃন্দের কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করেছি কেবল এই সতর্কবাণীটিসহ, যেমন রুশো নিজে বলেছিল তার অবুঝ এক সঙ্গীকে : আমাকে বুঝতে হলে আগে 'রুশোর অভিধান'-খানিকে তোমার পাঠ করতে হবে। রুশোর বাইরে রুশোর অভিধানকে সেকাল থেকে একালে কোনো পাঠক শত অনুসন্ধানেও পাননি। আমিও পাইনি। তার ফলে আমাদের এবং আমাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়েছে যে, আসলে রুশোই হচ্ছে রুশোর অভিধান এবং সেই অভিধান বারংবার পাঠ করা ব্যতিরেকে রুশোকে যে তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধি করা যাবে না : এ সত্যে কোনো অত্যুক্তি নেই।

'আমি রুশো বলছি' আমার কথাটি যতোই অহঙ্কারমূলক বলে বোধ হোক না কেন, আমি এমন একটি কর্ম শুরু করেছি যার, যেমন কোনো পূর্বগামী নেই, তেমনি তার অনুগামীও কখনো হবে না।

কনফেশনস গ্রন্থ পাঠে পাঠকবৃন্দ যতোই বিস্মিত এবং আহত হন না কেন, এ গ্রন্থ যে কোনো উপন্যাসের অধিক। অসাধারণ এবং অনন্য এক ব্যক্তির একটি আত্মপ্রতিকৃতি। এ আত্মপ্রতিকৃতি কেবল একটিমাত্র ব্যক্তির নয়, একজন মাত্র রুশোর নয়; একাধিক এবং বহুমাত্রিক এক রুশোর : যিনি যেমনি অশিক্ষিত, তেমনি স্বশিক্ষিত, যেমন একজন দার্শনিক, তেমনি একজন প্রেমিক, রাজনীতির ভাষায় গুপ্তচরও বটে, আবার অন্যতম সঙ্গীতজ্ঞ, তুলনাহীন একজন ঔপন্যাসিক : এমন এক ব্যক্তি যার কাছে অষ্টাদশ শতকের ইউরোপের কোনো ইতিহাস বিশ্রুত ব্যক্তিত্বই তাদের চরিত্রের অতলে অনাবিষ্কৃত থাকেননি। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম সড়ক নির্মাতা রুশো।

রুশোর আত্মকথা বা 'কনফেশনস' রুশোর দর্শনের অংশ নয়। তার দর্শন তার গ্রন্থসমূহের মধ্যে লাভ করা যায়। রুশোর আত্মকথা হচ্ছে রুশোর অস্তিত্ব– তার দৈহিক এবং মানসিক অস্তিত্বের প্রকাশ এবং তার দর্শনের ভিত্তিভূমি। এই অস্তিত্বেই তার দর্শন। তার দর্শন তার অস্তিত্ব থেকে অবিচ্ছিন্ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইমানুয়েল কান্ট

ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪ খ্রি.) ছিলেন অষ্টাদশ শতকের জার্মানির দার্শনিক ও বিজ্ঞানী। জার্মানিতে সনাতন ভাববাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর খ্যাতি। জার্মানির কনাইবার্গ শহরে তাঁর জন্ম। জীবনের পরবর্তী সময়ে এই কানাইবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেন।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কান্ট জ্যোতির্মণ্ডলের নীহারিকা তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি মনে করতেন, যে-জ্যোতির্মণ্ডলে আমাদের বাস তার বাইরেও সংখ্যাহীন জ্যোতির্মণ্ডলের মহাবিশ্ব বিরাজ করছে। পৃথিবী গ্রহের আবর্তনের জোয়ার-ভাটার বিপরীত প্রভাব এবং গতি স্থিতির আপেক্ষিকতার তত্ত্বকেও কান্ট প্রতিষ্ঠিত করেন। হেগেল ও মার্কসের দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের বিকাশে কান্টের এ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবদান অনস্বীকার্য।

AMARBOI.COM

কিন্তু কান্ট ভাববাদী দার্শনিক হিসেবেই অধিক পরিচিত। তাঁর ভাববাদকে অপরাপর ভাববাদ থেকে পৃথক করে ক্রিটিক্যাল অর্থাৎ বিচারবাদী বা বৈচারিক এবং ট্রান্সেন্ডেন্টাল বা অতিক্রমী ভাববাদ বলেও আখ্যায়িত করা হয়। কান্টের দার্শনিক জীবনকে আমরা বৈচারিক-পূর্ব এবং বৈচারিক-উত্তর যুগ হিসেবে বিভক্ত করতে পারি।

বৈচারিক-পূর্ব যুগে সত্তার প্রশ্নে কান্ট বাস্তব সত্তা এবং যুক্তিগত সত্তার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার প্রয়াস পান। এ যুগে কান্টের কাছে বিমূর্ত সূত্রের চেয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অধিকতর মূল্যবান বলে বিবেচিত হতো। এ ক্ষেত্রে কান্টের ওপর অভিজ্ঞতাবাদের প্রভাবকে আমরা লক্ষ্য করতে পারি। ১৭৭০ সাল থেকে কান্টের দর্শনে বিচারবাদী যুগের শুরু। তাঁর 'ক্রিটিক অব পিওর রিজন' বা 'বিশুদ্ধ যুক্তির সম্যক বিচার'-এর প্রকাশ ঘটে ১৭৮১ সালে এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ক্রিটিক অব প্র্যাকটিক্যাল রিজন' 'বাস্তব যুক্তির সম্যক বিচার'-এর প্রকাশ ঘটে ১৭৮৮ সালে।

এই সমস্ত গ্রন্থে কান্ট জ্ঞান, নীতি এবং নন্দনতত্ত্বের পর্যালোচনামূলক ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন। এ যুগে কান্টের প্রতিপাদ্য ছিল : জ্ঞানের প্রকার এবং মানুষের জ্ঞান-শক্তির সীমারেখার পূর্ব-আলোচনা ব্যতীত আমাদের পক্ষে কোনো দার্শনিক তত্ত্ব স্থির করা আদৌ সম্ভব নয়। জ্ঞানের সীমা এবং প্রকারের পর্যালোচনার মাধ্যমে কান্ট অজ্ঞেয়বাদের সঙ্কটে সমুপস্থিত হন। তাঁর প্রত্যয় ঘটে যে, বস্তু যেমন আছে, তাকে তেমনভাবে জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। জ্ঞানের কতকগুলি সূত্রের মাধ্যমেই মাত্র মানুষ বস্তুকে জানতে পারে। সূত্রের মাধ্যম না থাকলে মানুষ বস্তুকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারত। কিন্তু বস্তুর তেমন প্রত্যক্ষ জ্ঞান মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বস্তুকে মানুষ 'বস্তুত্ব'র সূত্র, সময়কে 'সময়'রূপ সূত্র দ্বারাই জানতে পারে। জ্ঞানের সূত্রগুলি মানুষ অভিজ্ঞতা-পূর্বরূপে লাভ করে। কিন্তু সূত্রই সত্তা নয়। 'সময়'রূপ সূত্রের মাধ্যমে আমরা সময়কে জানি। তার মানে এই নয় যে, সময়রূপ সূত্রই সময়। বস্তু সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ক্যাটেগরি বা সূত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কাজেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে বস্তু বা সত্তাকে জানি না, সত্তার সূত্র মাধ্যম প্রকাশকেই জানি।

নীতিশাস্ত্রে কান্ট 'ক্যাটেগরিক্যাল ইমপারেটিভ' বা 'শর্তহীন নিয়ামক'-এর বিধান তৈরি করেন। আচরণের ক্ষেত্রে শর্তহীন নিয়ামকের ব্যাখ্যা দিয়ে কান্ট বলেন, মানুষের আচরণের ন্যায়-অন্যায় কিংবা ভালোমন্দ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মানুষের আচরণের ফলাফল কোনো বিবেচনার বিষয় হবে না। বিষয়-নিরপেক্ষভাবে আচরণের ন্যায়-অন্যায় নির্দিষ্ট হবে। পিতা সন্তানকে পালন করবে সন্তানের কাছ থেকে ভবিষ্যতে প্রতিদানের আশায় নয়, সন্তানের প্রতি স্নেহের আকর্ষণে নয়—তাকে পালন করা তার কর্তব্য বলে সে তাকে পালন করবে। নন্দনতত্ত্বেও কান্ট বিষয় নির্বিশেষে এক আনন্দের কল্পনা করেন। কান্টের দর্শনে পরস্পরবিরোধিতা এবং অবাস্তবতার সাক্ষাৎ মেলে। সামাজিক বিকাশের প্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে কান্টের দর্শনের এই দুর্বলতার মূলে ছিল অষ্টাদশ শতকের জার্মান পুঁজিবাদী শ্রেণীর অনগ্রসরতা এবং দুর্বলতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেগেল

জর্জ উইলিয়াম ফ্রেডারিক হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১ খ্রি.) মধ্যে জার্মান ভাববাদী দর্শনের চরম প্রকাশ ঘটে। ভাবের বাস্তব তত্ত্বের জন্য অনেকে তাঁর দর্শনকে 'বাস্তব ভাববাদ' বলেও আখ্যায়িত করেন। হেগেল কান্টের দর্শনের সমালোচনার ভিত্তিতে নিজের দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। এতে কান্টের নিকট হেগেলের ঋণ প্রমাণিত হয়। কান্টের অভিমতের উল্লেখ ব্যতীত হেগেলের চিন্তার বিকাশ বোঝা সম্ভব নয়। নিম্নোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে কান্ট ও হেগেলের দর্শনের পারস্পরিক পার্থক্য নির্দিষ্ট করা যায়। ১. কান্ট তাঁর দর্শন দ্বারা এই কথা প্রকাশ করার চেষ্টা করেন যে মানুষের কাছে দৃশ্য বা জ্ঞেয়জগত মানুষের বুদ্ধিতে অতিক্রম করে যেতে পারে না। বুদ্ধির সূত্র হচ্ছে মানুষের কাছে জ্ঞানের একমাত্র সূত্র। বুদ্ধির মাধ্যমে জগত মানুষের কাছে যেভাবে উপস্থিত হয় মানুষ জগতকে সেইভাবে উপলব্ধি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই জ্ঞেয় বা দৃশ্য জগতই একমাত্র জগত নয়। বুদ্ধির অগম্য এবং মানুষের অজ্ঞেয় আর একটা জগত আছে—যাকে বলা হয় আসল জগত বা সত্তার সত্তা। হেগেল কান্টের বুদ্ধির সূত্র স্বীকার করে বলেন : বুদ্ধি দ্বারাই আমরা জগত বা সত্যকে জানি। বস্তুত বুদ্ধি বা প্রজ্ঞাই মানুষের জ্ঞানের একমাত্র মাধ্যম। বুদ্ধির অগম্য এবং মানুষের অজ্ঞেয় আসল জগত বলে কিছু আছে এরূপ কথা মানুষ বলতে পারে না। মানুষের জ্ঞেয় জগতই একমাত্র জগত। ২. কান্ট বুদ্ধিকে বোধ এবং প্রজ্ঞা বলে দুভাগে ভাগ করে বোধকে আংশিক অজ্ঞতার ব্যাখ্যাতা এবং প্রজ্ঞাকে চরম সত্য উপলব্ধির মাধ্যম হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। হেগেল বলেন, বুদ্ধির মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য করা গেলেও সমগ্র, বুদ্ধিদত্ত যে সত্য তার মধ্যে কোনো বিভাগ করা চলে না। সত্যের সমগ্রই সত্য। ৩. কান্ট মানুষের জ্ঞানের সীমা জ্ঞেয় বা দৃশ্য জগতে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। হেগেল বলেন, আমাদের জ্ঞানের জগতকে আমরা দৃশ্য জগত বা মায়া বলি। কারণ আমরা এই জগতের প্রকাশের সামগ্রিকতাকে উপলব্ধি করতে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারি না। দৃশ্য জগতের প্রকাশের কারণ যখন আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই, তখন আর দৃশ্য জগত আংশিক বা মায়া বলে বোধ হয় না। তখন আমরা বুঝতে পারি, এটাই একমাত্র জগত। ৪. নীতির ক্ষেত্রে কান্ট এমন এক মহৎ বা আদর্শের কল্পনা করেছেন যে আদর্শ কখনো বাস্তবায়িত হতে না পারলেও মানুষ তাকে একমাত্র বাস্তব বলে ভাবতে বাধ্য। হেগেল বলেন, আমরা আদর্শের বিকাশের পর্যায়গুলি বুঝতে অক্ষম বলেই কোনো আদর্শ আমাদের কাছে অন্যায় ও অবাস্তব বলে বোধ হয়। আদর্শের বিকাশের পর্যায়কে সম্যকভাবে উপলব্ধি করলে বাস্তব-অবাস্তবের বিরোধ দেখা দিতে পারে না। ৫. কান্ট জ্ঞানের সূত্রকে বিকাশের সম্ভাবনাহীন অনড় স্থির সূত্র বলে মনে করেছেন। কান্টের কাছে জ্ঞান-সূত্রের উৎস মানুষের কাছে অজ্ঞেয়। অজ্ঞাত কোনো শক্তি মানুষের জন্য অপরিহার্য এই জ্ঞানসূত্রগুলি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। হেগেল মনে করেন, জ্ঞানের সূত্রগুলি অপরিহার্য বটে। কিন্তু এগুলি বিকাশের সম্ভাবনাহীন অনড় বা এর উৎস অজ্ঞেয় নয়। হেগেলের মতে, দর্শনের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে জ্ঞানসূত্রের উৎসের এই রহস্য ব্যাখ্যা করা। দর্শন আমাদের বলবে, যে সূত্রগুলি আমরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি সেগুলি আমরা কেনইবা ব্যবহার করি এবং সূত্রগুলি কীভাবে মানুষের জীবনে বিকশিত হয়েছে।

কান্টের সঙ্গে নিজের দর্শনের এই পার্থক্য ব্যাখ্যা করে হেগেল ভাবের বিকাশের দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব তৈরি করেন। দ্বন্দ্বই হচ্ছে ভাব বা অস্তিত্বের বিকাশের মূল কারণ। অস্তিত্বের মধ্যে নিরন্তর 'হ্যাঁ এবং 'না'-এর দ্বন্দ্ব চলছে। বিকাশের এই তত্ত্বের ব্যাখ্যায় হেগেল 'পরিমাণ থেকে গুণের' তত্ত্বও উপস্থিত করেন। অস্তিত্বের মধ্যে পরিবর্তন পরিমাণগতভাবে বৃদ্ধি পেতে পেতে বিশেষ পর্যায়ে নতুন গুণের উদ্ভট ঘটায়।

সমাজের ইতিহাস ও বিজ্ঞানের বিকাশকে অগ্রসর সচেতন চিন্তার দ্বারা উপলব্ধি করে হেগেল অস্বীকার করলেও হেগেলের নিকটও মূল হচ্ছে ভাব; বস্তু নয়। যা কিছু জ্ঞেয় বা দৃশ্য সবই হচ্ছে ভাবের প্রকাশ ও বিকাশ। এ ছাড়া ভাবের চরম বিকাশ জার্মান রাষ্ট্রযন্ত্রে ঘটেছে বলে হেগেলের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে স্বৈরতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের আদর্শগত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পেরেছে। বস্তুত হেগেল-দর্শন থেকে উত্তরকালে দুটি পরস্পরবিরোধী ধারার বিকাশ ঘটেছে; এর একটি হচ্ছে মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ; অপরটি হচ্ছে নবভাববাদ ও স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক মতবাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩ খ্রি.) বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ এবং দ্বন্দ্বমূলক ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা এবং উনবিংশ শতকের শ্রমিক শ্রেণীর সাম্যবাদী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে ইতিহাসে বিখ্যাত। ছাত্রাবস্থাতেই কার্ল মার্কস হেগেলের দর্শনের প্রভাবে এলেও হেগেলীয় দর্শনের বামপন্থী এবং প্রগতিশীল ভাবসমূহই মার্কসকে অধিকতর আকৃষ্ট করে। হেগেলের অনুসারীদের মধ্যে তিনি বামপন্থী হেগেলবাদী বলে পরিচিত হন। পরবর্তীকালে মার্কস ক্রমান্বয়ে যতো প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবী আন্দোলনে নিজেকে লিপ্ত করে তোলেন ততো বেশি তিনি হেগেলের দর্শনের ভাববাদী প্রভাব কাটিয়ে উঠতে থাকেন। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং ফয়েরবাকের বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে তার পরিচয় মার্কসকে পরিপূর্ণভাবে হেগেলীয় দর্শনের আওতার বাইরে টেনে আনে। তিনি এই সময় থেকে তীব্রভাবে হেগেলের দর্শনের বৈপরীত্য, তার অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি, বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তার ভাব-ব্যাখ্যার বিরোধ ইত্যাদি সম্পর্কে মার্কস তাঁর বিরোধী অভিমত ব্যক্ত করতে থাকেন। ১৮৪৮ সালে জার্মানিতে কৃষক এবং শ্রমিকের যে বিপ্লবাত্মক অভ্যুত্থান ঘটে তাতে এবং পরবর্তীকালে প্যারিস শহরের শ্রেণীসংগ্রামে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মার্কস পরিপূর্ণরূপে সাম্যবাদী নেতায় পরিণত হন। এ সময়ে মার্কসবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং মার্কসের কর্মজীবনের একনিষ্ঠ সাথী ফ্রেডারিক এঙ্গেলস মার্কসের সঙ্গে এসে মিলিত হন। মার্কস এবং এঙ্গেলস উভয়েই মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের ওপর গভীর গবেষণার মাধ্যমে এক নতুন দিগদর্শন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৭ সালে মার্কস এবং এঙ্গেলস ব্রুসেলস শহরে সাম্যবাদী দল নামে একটি গোপন শ্রমিক সংস্থা সংগঠিত করেন। এই সংগঠনের দ্বিতীয় কংগ্রেসে দুই বন্ধু, 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' বা 'সাম্যবাদের ইশতেহার' (১৮৪৮ সালে) রচনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন। 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' মার্কসবাদের অন্যতম মৌলিক দলিলবিশেষ। এই ইশতেহারের মধ্যে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তীক্ষ্ণভাবে ইতিহাসের দ্বন্দ্বমূলক বিকাশের তত্ত্ব বিবৃত করে উনবিংশ শতকের ইউরোপে শ্রমিক শ্রেণীকে পুঁজিবাদের গর্ভে নতুন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনিবার্য শক্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মার্কসের দর্শনের ঐতিহাসিক প্রকাশ ঘটেছে উনবিংশ শতকের ইউরোপীয় সমাজের অর্থনীতিক ও সামাজিক অবস্থার ওপর রচিত তাঁর গভীর গবেষণামূলক 'দি ক্যাপিটাল' বা পুঁজি নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ সালে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন এঙ্গেলস মার্কসের মৃত্যুর পরে যথাক্রমে ১৮৮৫ ও ১৮৯৪ সালে। ভারতবর্ষের সামাজিক বিকাশ, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভারত শোষণের স্বরূপ এবং ১৮৫৭ সালের সিপাহি যুদ্ধের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে মার্কস আমেরিকার একটি সাময়িকপত্রে প্রবন্ধরাজি প্রকাশ করেন, মার্কসের গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির স্মারক হিসেবে তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যও অপরিসীম। বিপ্লবী কার্যক্রমের অভিযোগে জার্মানি এবং পরবর্তীকালে বেলজিয়াম সরকার কর্তৃক নির্বাসিত হয়ে ১৮৪৮ সালের পর থেকে মার্কস সপরিবারে লন্ডন শহরে বাস করতে থাকেন। ১৮৮৩ সালের ১৪ মার্চ মার্কস লন্ডন শহরে মারা যান।

মানুষের অস্তিত্বের স্ববিরোধী এই ব্যাখ্যার চরম যখন পৌঁছল উনবিংশ শতাব্দীতে তখন স্বাভাবিকভাবেই মার্কস বলেছিলেন : 'দার্শনিকের হাতে জগতের ব্যাখ্যা কম হয়নি; আজ প্রয়োজন হচ্ছে ব্যাখ্যার নয়, প্রয়োজন জগতকে পরিবর্তিত করা।' এ কথা শুনে প্রতিষ্ঠিত শাসক সমাজের দার্শনিকগণ তারস্বরে বলে উঠলেন, 'এ কেমন কথা! আমাদের কাজ হলো জগতকে জানা, কেবলই জানা। বস্তুকে জানা। সত্যকে জানা। বস্তু তো বস্তুই থাকবে। জগত তো যেমন আছে তেমনই থাকবে। এবং সত্য সত্যই থাকবে। তাকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা আমাদের কোথায়? এর জবাবে আবার আমাদের আদিতে ফিরে যেতে হয়। কিন্তু জ্ঞান কিসের জন্য? সে তো বাঁচার জন্য। মানুষ বাঁচবে কেমন করে? জগতকে জয় করেই তো বাঁচবে। জগতকে সে জয় করবে কেমন করে? নিজের স্ববিরোধিতা দূর করার মাধ্যমেই তো? ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তির এবং শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীর আত্মবিধ্বংসী ক্রিয়াকাণ্ডের অবসান ঘটিয়েই তো।

মানুষের অপর নাম যুক্তিবাদী জীব। কার্ল মার্কস মানুষ হিসেবে তাই অতি স্বাভাবিক যুক্তির কথাই তাঁর মূল অভিমতে তুলে ধরেছেন। কিন্তু যুক্তিবাদী জীবের মধ্যেই পশুর চেয়েও যেমন সর্বাধিক অযৌক্তিক অভিমতের স্থান তেমনি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিষ্ঠিত দর্শনের ইতিহাসে মার্কসের এই স্বাভাবিক অভিমত আজও স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করা হয়নি। আর তাই এখনো দর্শনের পরিচয় বা দর্শনের ভূমিকা বা ইতিহাস জাতীয় এমন পাঠ্যপুস্তকের অভাব নেই যে পাঠ্যপুস্তকে মার্কস এবং মার্কসের জীবন ও জগত সম্পর্কে মার্কসীয় অভিমতের কোনো নাম-ঠিকানা আদৌ খুঁজে পাওয়া যায় না।

পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে, সূর্য পৃথিবীকে নয়। এ কথাটা আজ সত্য বলে গৃহীত। কিন্তু একদিন এ সত্য কথা মানুষের সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে মানুষ কপারনিকাস, মানুষ গ্যালিলিওকে কতো না আশঙ্কা, কতো না নির্যাতনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। মার্কসের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। সমাজের ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে তার গতির বাস্তব মূলসূত্রের কথা বলার জন্য দেশ থেকে দেশান্তরে নির্বাসনের দণ্ডে তাকে ভুগতে হয়েছে। আর কপারনিকাস, গ্যালিলিও বা মার্কস কারোর অভিমতই তাঁদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রকাশ নয়। তবে দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সত্যসন্ধানী কপারনিকাস বা গ্যালিলিও থেকে মার্কস এইখানে পৃথক যে, মার্কসের দর্শন মার্কসকেও তাঁর নির্যাতনের কার্যকারণ উপলব্ধিতে সাহায্য করেছে, যে উপলব্ধি কপারনিকাস বা গ্যালিলিওর মধ্যে সম্ভব ছিল না। গ্যালিলিও হয়তো জানতেন না পৃথিবী ঘুরছে এ সত্যে যে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ধর্মসংস্থা আপত্তি করছে তাদের আপত্তির কি কারণ আছে এবং নির্যাতনের চরমে তিনি হয়তো অসহায় ব্যক্তির মতো উচ্চারণ করেছেন : হে ঈশ্বর, তুমি এদের ক্ষমা করো : এরা জানে না এরা কি করছে; কিন্তু নির্যাতিত মার্কস তাঁর দুর্দশার চরমেও কখনো মনে করেননি যে, প্রতিষ্ঠিত সমাজ তাঁকে নির্যাতন করে ভুল করেছে কিংবা ভুল করে তাঁকে নির্যাতন করছে। তাঁর প্রতি নির্যাতনকে তিনি তার বিশ্লেষণের সত্যতার এক প্রমাণ হিসেবেও যেমন দেখেছেন তেমনি একথা তিনি জানতেন যে, অসঙ্গত পুঁজিবাদী সমাজের পক্ষে তাঁর বিশ্লেষিত সত্য মরণকাঠি স্বরূপ। এ মরণকাঠির প্রচার আহত শিকার প্রাণপণে রোধ করার প্রয়াস পাবে তাতে অস্বাভাবিকতার কি আছে? আর এ-ও সত্য যে, অসঙ্গতির চরম যে সমাজে পৌঁছেছে সে সমাজ তার মরণকাঠির বাহকের কণ্ঠ রোধ করে নিজের পরমায়ু নিশ্চিত করতে পারবে না। অসঙ্গতি সৃষ্টি বাদে পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা এবং প্রসার যেমন সম্ভব হয়নি তেমনি অসঙ্গতির বিরামহীন সৃষ্টি সে সমাজের নির্ঘাত রূপান্তরকে ক্রমান্বয়ে নিকটতর না করে পারে না। সঙ্গতি-অসঙ্গতির বিরোধ বস্তুজগতের গতির ন্যায়ই সমাজজীবনের গতিরও মূল কারণ। বিরামহীন পরিক্রমার প্রকাশ হচ্ছে বস্তুজগত। এ সত্য আমি মানি কিংবা না মানি তাতে বস্তুজগতের কিছু যায় আসে না। যে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে মানছিনে সে আমিও সেই গতিময় বস্তুরই প্রকাশ। ফরাসি দার্শনিক দেকার্ত চরম সত্যের সন্ধানে একদিন বলেছিলেন, আমি সন্দেহ করতে পারি সব অস্তিত্বকেই—কেবল আমি সন্দেহ করতে পারিনে নিজের অস্তিত্বকে : 'কজিটো আরগো সাম' ফরাসি ভাষার বিখ্যাত বাক্যঃ কেননা আমার সন্দেহেই আমার অস্তিত্ব। তেমনি সঙ্গতি-অসঙ্গতির বিরোধই মনুষ্য সমাজের সামাজিক বিকাশের মূলসূত্র। তাকে আমি স্বীকার করতে পারি। তাকে আমি অস্বীকার করতে পারি। তাতে ক্রিয়ারত সেই সত্যের কিছু যায় আসে না। মার্কস জানতেন মার্কসের আবিষ্কারের জন্য এ সত্য জন্মের অপেক্ষায় ছিল না। সমাজের ক্রমবিকাশের সত্যই মার্কসের আবিষ্কারকে সম্ভব করেছে; মার্কসের আবিষ্কার সমাজের বিকাশের সত্যকে নয়। বস্তু গতিশীল এ বোধ আদিকালের দার্শনিক বৈজ্ঞানিক এবং চিন্তাশীলদের মধ্যে ছিল। যে গতিশীলতার মূল কারণ সেদিন তাঁরা হয়তো ব্যাখ্যা করতে পারেনি। ব্যাখ্যার উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ এবং উপকরণের সেদিন অভাব ছিল। কিন্তু তার পরে মানুষের শ্রমে সভ্যতার সৌধ যতো উঁচু হতে লাগল ততোই সৌধের সৌভাগ্যবানগণ বুঝতে পারলেন যে বস্তু গতিশীল, পৃথিবীটা গতিশীল—এ তত্ত্ব আর যাদের মস্তকে ঢুকুক না কেন সভ্যতার পিলসুজের মস্তিষ্কে যেন কোনোক্রমেই না ঢুকতে পারে; যেন দাস না বুঝতে পারে যে তাদের হাত-পায়ের পরিশ্রমেই প্রভুর মাথার ওজন বাড়ছে কিন্তু সে ভারি মাথা দাসের পায়ের শিকলের সমবেত বঞ্চনায় কুপোকাত হতে পারে; যেন ভূমিদাস বুঝতে না পারে যে এতদিনকার অক্ষয় দাস প্রথারও ক্ষয় ঘটেছে তার নতুন উৎপাদনের হাতিয়ারের শক্তি তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সৌধ চূড়ায় সুধাকরদের সেই প্রয়াসেই সৃষ্টি হয়েছে বিধাতার বিধান; বিধাতা হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান বানাননি; যুক্ত হয়েছে রাজার সশস্ত্র হাতের সঙ্গে ধর্মীয় সংস্থার [illegible] বাহুর। কিন্তু যে সত্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা শ্রেণীর স্বীকার-অস্বীকারের অ[illegible] রাখে না তাকে রোধ করার সাধ্য কোথায়? দাসকে দাবাতেও দরকার হয় ক্রমাধিক উন্নত ধরনের অস্ত্রের; বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে প্রয়োজন হয় দীর্ঘ সড়কের আর দ্রুত যানের। উৎপাদনের উপায়ের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয় উৎপাদককে বঞ্চিত করার পেষণ যন্ত্রেরও। সে যন্ত্র ক্রমাধিক পরিমাণে হয়ে ওঠে সুসংহত; বিভাগ থেকে বিভাগের সঙ্গে শৃঙ্খলিত আর কেন্দ্রীভূত। সে কেন্দ্রে বসে শাসক এবং শোষক যেমন একদিকে আনন্দ মদিরায় ঢুলু ঢুলু আত্মবিশ্বাসে বলে : দেখ কি আমার কীর্তি; কি বিরাট পরিধি। কেন্দ্র থেকে আমার একটি মাত্র সংকেত তার পেষণযন্ত্র আ-সীমা ঝনঝন করে বেজে উঠে, নির্মমভাবে সে বিদ্রোহীকে দলে-পিষে শেষ করে দেয়। আবার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিষ্পেষিত মানুষও অসংখ্য হাতের সম্মিলিত শক্তির দিকে চেয়ে আত্মবিশ্বাসে শিহরিত হয়ে নিষ্পেষণ যন্ত্রের কেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে ভাবে : একটি সম্মিলিত আঘাতে ওই কেন্দ্রের প্রাণভোমরাকে হাতের মুঠোয় নিতে পারলেই ব্যস—আর যায় কোথা এই দর্প-সম্রাট। যেখানে ওর শক্তি, সেখানেই ওর সংহার।

মানুষের প্রয়োজনের চেয়ে বড় দাবি আর কিছুর নয়। মানুষের শ্রমই সেই প্রয়োজনের দাবিকে পূরণ করার একমাত্র মাধ্যম। প্রয়োজন আর শ্রমের ভিত্তিতেই মধ্যযুগের গোঁড়ামির কুয়াশাকে ভেদ করেছে বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞান আবার তৈরি করেছে আধুনিকতম উৎপাদন যন্ত্রকে এবং তার বাহন—শ্রমিককে। পুঁজিবাদের স্বভাব পুঁজি সৃষ্টি করা। কম থেকে বেশি। বেশি থেকে আরো আরো বেশি। এজন্য একদিন সে ভূমিদাসকে সামন্ততন্ত্রের বেড়া ভেঙে কলের শিকলে বেঁধে দিয়েছিল। ভেবেছিল তার হুকুম মতোই দু'হাতী প্রাণীগুলো কেবল কলকব্জার নাট-বোল্ট টাইট করবে আর ভারে ভারে তার শ্রমের ফসল পণ্য দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করে তুলবে।

মার্কসবাদের আবির্ভাব ইতিহাসের এই ক্রান্তি মুহূর্তেই। নাট-বোল্ট ঘুরাতে ঘুরাতে যন্ত্রদানবকে একটি মোচড়ে নির্বাক করে দেবার কৌশলটির ফাঁক ধরতে পেরে দু'হাতী প্রাণীগুলো বোবা হলেও শক্তির উপলব্ধিতে যখন কেঁপে কেঁপে উঠছিল সে মুহূর্তে মার্কস সে বোবা মুখের বাঁধন খুলে দিলেন। মার্কস এবং এঙ্গেলস দেখালেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রমিককে কেমন করে একদিনের প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ারের বাহন দাস আজ জটিল যন্ত্রের নিয়ন্ত্রক শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছে; আর কেমন করেইবা দাসপ্রভু আজ পুঁজি আর শ্রমিকের একচেটিয়া মালিকে পরিণত হয়েছে। এ বিশ্লেষণ ইতিহাসের বিশ্লেষণ, কল্পনার ফানুস নয়। বঞ্চিতের বেদনা অতীতকালেও বহু সমাজকর্মী ধর্মপ্রাণ মহৎ ব্যক্তি কিংবা দার্শনিক বোধ করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের এ বিশ্লেষণ কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীতেই সম্ভব হয়েছে। ব্যক্তি হিসেবে মার্কস তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং মহৎ মানুষের মন দিয়ে সংখ্যাধিক নির্যাতিত মানুষের পক্ষ নিয়ে ইতিহাসের অগ্রগতির মূল কারণটিকে ব্যক্ত করে দিয়েছেন। শুধু নির্যাতিত মানুষের পক্ষ নিয়ে মনুষ্য সমাজের জন্যই তাঁর সে অবদান মানুষের জ্ঞান এবং সমাজের অসঙ্গতি দূরীকরণের মানবিক প্রচেষ্টায় এক অনন্য বিপ্লব সাধন করেছে। জ্ঞানের চেয়ে বড় শক্তি আর কিছু নেই। মার্কস নির্যাতিতের হাতে এতোদিনকার লুক্কায়িত সেই জ্ঞান অস্ত্রকে তুলে দিয়েছেন। বিধাতা নাকি মানুষকে আদেশ করেছিলেন : 'মানুষ! তুমি নিজেকে জান' কিন্তু এ বিধান যাদের মাধ্যমে তিনি এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বভূমণ্ডলে পাঠিয়েছিলেন তাঁরা বুঝেছিলেন এমন মারাত্মক অস্ত্র আপামর সব মানুষের হাতে পড়লে বিধাতাসহ বিধাতার বাহনদেরও রক্ষা থাকবে না। তাই 'মানুষ নিজেকে জান' বিধানের বদলে জারি হয়েছিল অজ্ঞানতার মোক্ষম বিধান : 'মানুষ! তুমি কি আদি পুরুষ আদমের আদি অপরাধের কথা বিস্মৃত হয়েছ। জ্ঞানবৃক্ষের ফল বিধাতার নিষেধ সত্ত্বেও সে ভক্ষণ করেছিল। তাই মর্ত্যের দুর্ভোগে সে নিপতিত হয়েছে।' এই বিধানের প্রতাপেই নিষ্পেষিত মানুষ যুগ থেকে যুগে কেবল তার নিজের হাতের উৎপাদিত জীবিকার উপায় থেকেই বঞ্চিত থাকেনি, সে বঞ্চিত রয়েছে সেই বঞ্চনার কার্যকারণের জ্ঞান থেকেও। মার্কস সেই নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের ফল পরিবেশন করলেন বঞ্চিত মানুষের সামনে। বঞ্চকের কাছে এর চেয়ে মারাত্মক অপরাধ আর কি হতে পারে।

আদি থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যকালীন অবধি ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে মার্কস বললেন :

১. কেবল বস্তুই গতিশীল নয়; মানুষের সমাজও গতিশীল।

২. বস্তুর গতি যেমন বস্তুর অন্তর্নিহিত কণায় কণায় দ্বন্দ্বে, মানুষের সমাজের গতিও তেমনি উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্কের অসঙ্গতির দ্বন্দ্ব। একদিন ছিল যেদিন মানুষ যূথবদ্ধ ছিল প্রকৃতির বিরুদ্ধে। সেই আদিম অবস্থায়ও তার গতির মূলে ছিল প্রকৃতিকে জয় করার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব। আবার একদিন আসবে যেদিন মানুষ উৎপাদনের উপায় ও সম্পর্কের কৃত্রিম দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে আদিম অবস্থার চেয়ে একেবারেই নতুনরূপে যূথবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে আবার প্রকৃতিকে অচিন্ত্যনীয়ভাবে জয় করার জন্য।

৩. বস্তুর গতির ক্ষেত্রে পরিমাণগত পরিবর্তন যেমন একটি চূড়ান্ত মুহূর্তে গুণগত রূপান্তর সৃষ্টি করে, মানুষের সমাজেও অসঙ্গতির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব চরম মুহূর্তে বিপ্লব এবং সামাজিক রূপান্তরের সূচনা করে।

৪. সমাজ দ্বন্দ্বমূলক গতির নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। যদি একে দ্বন্দ্বমূলক ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলা যায় তাহলে বলতে হবে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ মানুষের সমাজের বিকাশে বস্তুজগতের মৌলিক নিয়মের ন্যায়ই অমোঘ। পঁচিশ-পঞ্চাশ বছরের হেরফেরে এ নিয়মের মৌলিক কোনো হেরফের ঘটতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্কসবাদ হচ্ছে মানুষের সমাজ এবং জগতকে সামগ্রিকভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার সর্বাধিক পরিপূর্ণ দর্শন। জগত ও জনগণের সর্বক্ষেত্রে এর মূল সূত্রের প্রয়োগ। ওপরে কেবল সামাজিক বিশ্লেষণের দিকটির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক এতোদিন ইতিহাস রচনা করেছেন; সমাজবিদ সমাজের ঘটনা স্তূপীকৃত করেছেন; অর্থনীতিবিদ অর্থশাস্ত্রের এক নিয়ম তৈরি করেছেন আর এক নিয়ম ভেঙে দিয়েছেন। ধর্মতত্ত্ব ঈশ্বরের বিধান বহন করে মানুষকে বিমুগ্ধ রাখার চেষ্টা করেছে। সব মিলে সমস্ত শক্তির আধার মানুষের সমাজ অধিকাংশ মানুষের কাছে অলৌকিক রহস্যময় রঙ্গমঞ্চ বলে বোধ হয়েছে। সে রঙ্গমঞ্চে মানুষ নিজেকে অসহায় দর্শক কিংবা পার্শ্বচরিত্র হিসেবেই দেখেছে। এ নাটকের সূচনা এবং পরিণতি তার কাছে নির্যাতিত মানুষকে জীবননাট্যের মূল নায়কের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং পরিণামে মনুষ্য সমাজের সামনে সঙ্গতিপূর্ণ একটি স্বাভাবিক সমাজের অনিবার্য সম্ভাবনাকে তুলে ধরেছে। এখানেই তাঁর ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদিত; এখানেই তার ভূমিকার অভিনবত্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্

আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদী আন্দোলন এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কার্ল মার্কসের সঙ্গে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের (১৮২০-১৮৯৫ খ্রি.) নাম যুক্তভাবে উচ্চারিত হয়। চিন্তা, আদর্শ এবং সংগ্রামী আন্দোলনের ইতিহাসে যৌথ প্রয়াস এবং অবিচ্ছিন্ন সাথীত্বের এরূপ দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। জার্মানিতে জন্ম হলেও এঙ্গেলস তাঁর সংগ্রামী জীবনের অধিকাংশকাল ইংল্যান্ডে অতিবাহিত করেন। ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত তাদের পারিবারিক একটি শিল্পে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতে তিনি ইংল্যান্ড আগমন করেন এবং কার্ল মার্কস-এর সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকে তাঁর আমরণ সংগ্রামী সাথীতে পরিণত হন। কার্ল মার্কস বিপ্লবী চিন্তা এবং আন্দোলনের জন্য জার্মানির তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক সরকার কর্তৃক বহিষ্কৃত হয়ে ইংল্যান্ডে তখন নির্বাসিতের জীবন-যাপন করছিলেন। কিশোর বয়স থেকেই এঙ্গেলস চিন্তাধারায় বস্তুবাদী এবং সংগ্রামী অগ্রসর মানুষের পক্ষভুক্ত ছিলেন। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি জার্মান দার্শনিক শেলিং-এর ভাববাদী দর্শনকে সমালোচনা করে একখানি বই লেখেন। ১৮৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মানিতে সামন্তবাদের বিরুদ্ধে কৃষক ও শিল্পের শ্রমিকদের বিপ্লবী আন্দোলনের কাল ছিল। এই বিপ্লবী আন্দোলনের পরাজয়ের পরে তিনি দেশ ত্যাগ করে ইংল্যান্ড গমন করেন। ধনতান্ত্রিক সমাজের বিকাশে ইংল্যান্ড তখন শীর্ষস্থানে। ইংল্যান্ডের শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের বাস্তব জীবনের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা এঙ্গেলসকে ধনতন্ত্রবাদের মৌলিক বিরোধ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ রূপে প্রত্যয়ী করে তোলে।

এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এঙ্গেলস 'ইংল্যান্ডের শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা' নামে তাঁর অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে মার্কসের সঙ্গে যুক্তভাবে তিনি 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' রচনা করেন। 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল তখনকার সাম্যবাদী দলগুলোর ঘোষণাপত্র। কমিউনিস্ট ইশতেহার তখন থেকে কেবল বিপ্লবী দলের ঘোষণাপত্র নয়। মার্কসবাদী তত্ত্বের স্পষ্টতম এবং অতুলনীয় ঘোষণাসার হিসেবে পৃথিবীময় পরিচিত হয়ে আসছে। উল্লেখ্য, এঙ্গেলসের আর্থিক আনুকূল্য ব্যতীত মার্কসের পক্ষে ইংল্যান্ডে জীবন ধারণ করা এবং তাঁর সমাজবাদী গবেষণা চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ত। পুঁজিবাদী সমাজের বিশ্লেষণ ও সমালোচনার গ্রন্থরাজি হিসেবে মার্কসের 'পুঁজি' বা 'ক্যাপিটাল' সুবিখ্যাত। মার্ক এ গ্রন্থসমূহের রচনাতে এঙ্গেলসের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং বাস্তব সাহায্য লাভ করেন। মার্কসের মৃত্যুর পরে তাঁর 'ক্যাপিটালের' দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের সম্পাদনার কাজ এঙ্গেলস্ সমাধা করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা, 'এ্যান্টিডুরিং', লুডউইগ ফয়েরবাখ, 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' প্রভৃতি গ্রন্থ এঙ্গেলস-এর মনীষার উদাহরণ। তাঁর অনবদ্য আকর্ষণীয় রচনারীতি মার্কসবাদের সামাজিক বিশ্লেষণ ও দার্শনিক অভিমতসমূহকে জনপ্রিয় করে তুলতে বিরাটভাবে সাহায্য করেছে। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেক গ্রন্থেই তিনি মার্কসবাদের প্রতিপক্ষীয়দের অভিমতকে খণ্ডন করে ব্যাখ্যার মাধ্যমে মার্কসবাদের তত্ত্বে আপন মনীষার সংযোজন ঘটিয়েছেন। দর্শনের ক্ষেত্রে তিনি প্রচলিত ধারণাকে সমালোচনা করে দেখান যে, দর্শনকে বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বা এরূপ অতি-বাস্তব উচ্ছ্বাসমূলক আখ্যাদান কৃত্রিম এবং অজ্ঞানতার পরিচায়ক। দর্শন কোনো রহস্যলোক নয়। দর্শনের ভূমিকা হবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখাকে সংযুক্ত করে জানার কৌশল উদ্ভাবনে মানুষকে সাহায্য করা, কোনো অতি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার নয়, তাঁর সমস্ত গ্রন্থই তিনি যে কোনো যুগ বা ব্যক্তির দর্শনের শ্রেণী চরিত্র প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে ব্যাখ্যা করে এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে, স্থূল বস্তুবাদ বা ইতোপূর্বেকার যান্ত্রিক বস্তুবাদের সাথে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের পার্থক্য আছে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ মনকে যেমন বস্তুর অতিরিক্ত স্বাধীন কোনো সত্তা বলে স্বীকার করে না, মনকে বস্তুর জটিল বিকাশের বিশেষ পর্যায় বলে বিবেচনা করে, তেমনি মন অস্বীকারও করে না। বস্তুর সঙ্গে মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্ককে সে গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করে। সমাজের বিকাশে মানুষের জীবিকার ভূমিকা প্রধান কিন্তু ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকাকেও মার্কসবাদ নস্যাৎ করে না। জীবিকা যেমন ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি আবার ব্যক্তিও তার মস্তিষ্ক ও মনের চিন্তা-ভাবনা দ্বারা সেই বাস্তব জীবিকার অবস্থা পরিবর্তন করার ক্ষমতা বহন করে। এঙ্গেলস-এর রচনাবলীতে বস্তু এবং গতি, সময় ও স্থানের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, জ্ঞানের ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক, অজ্ঞেয়বাদের অসারতা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বস্তুর উপাদানের জটিল গঠন এবং তার অনুন্মোচিত অসীমতা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা এবং সম সমস্যার তাঁর সুস্পষ্ট মার্কসবাদী অবদানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের একখানি গ্রন্থের প্রচলিত নাম হচ্ছে 'এ্যান্টিডুরিং'। আসলে এঙ্গেলসের গ্রন্থখানির মূল নাম হচ্ছে: 'হার ইউজেন ডুরিংস রিভোল্যুশন ইন সায়েন্স' বা 'হার ইউজেন ডুরিংকৃত বিজ্ঞানে বিপ্লব'। নামটির মধ্যে একটি ব্যঙ্গাত্মক সুর আছে। কারণ ডুরিং নামক সমকালীন এক লেখক মার্কসবাদের ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন। তাঁর সেই ভুল ব্যাখ্যার সমালোচনা হিসেবে এঙ্গেলস ১৮৭৬ সালে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। এই সমস্ত সমালোচনামূলক প্রবন্ধের সংকলন উল্লিখিত নামে ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। এ্যান্টিডুরিংয়ের মধ্যে এঙ্গেলস মার্কসবাদের তিনটি মূল দিকের ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন: ১. দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ; ২. রাষ্ট্রনীতিক অর্থনীতি; ৩. বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের তত্ত্ব। গ্রন্থের তিনটি ভাগে এই মূল বিষয়গুলির আলোচনা করা হয়।

প্রথমভাগে এঙ্গেলস দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ব্যাখ্যা পেশ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি দর্শনের মূল প্রশ্ন কি, বস্তুজগতের মূল বিধান, জ্ঞানের সমস্যা, স্থানকালের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এবং বস্তুর গতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনায় এঙ্গেলস বিবর্তনের ডারউইনীয় তত্ত্ব, বিকাশে জৈবকোষের ভূমিকা, কান্টের বিশ্বতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের ওপরও তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন। এই অংশে এঙ্গেলস সামাজিক নীতি, সাম্য এবং ব্যক্তির কার্যে স্বাধীনতা এবং অনিবার্যতার প্রশ্নও আলোচনা করেন।

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে এঙ্গেলস রাষ্ট্রনীতিক অর্থনীতির বিশ্লেষণকালে ডুরিংয়ের তত্ত্বের সমালোচনা করেন। দ্রব্যমূল্য, উদ্বৃত্ত মূল্য, পুঁজি, জমির খাজনা প্রভৃতি অর্থনীতিক প্রশ্নে মার্কসবাদের তত্ত্বগুলি এঙ্গেলস ব্যাখ্যা করেন। সমাজের বিকাশের মূল নিয়ামক কে? ব্যক্তি কিংবা রাষ্ট্রীয় শক্তি? না মানুষের অর্থনীতিক সম্পর্ক? এই প্রশ্নে শক্তির তত্ত্বকে নাকচ করে অর্থনীতির সম্পর্কের নিয়ামক ভূমিকার কথা এঙ্গেলস ব্যাখ্যা করেন এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও অর্থনীতিক শ্রেণীর উদ্ভব এবং বিকাশকে প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেন। গ্রন্থের তৃতীয়ভাগে এঙ্গেলস বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করেন এবং কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে তার পার্থক্য নির্দিষ্ট করে দেন। সমাজতন্ত্রের এবং সাম্যবাদে দ্রব্যের উৎপাদন এবং বণ্টন কী রূপ গ্রহণ করবে, পরিবারের কি রূপান্তর সম্ভব, শিক্ষাব্যবস্থা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কীভাবে পুনর্গঠিত হবে, শহর ও গ্রামের মধ্যকার বিরোধ কীভাবে বিলুপ্ত হবে, দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমের পার্থক্য কীভাবে নির্ধারিত হবে—সমাজতান্ত্রিক সমাজের ইত্যাকার সমস্যারও এঙ্গেলস আলোচনা করেন এবং তা সমাধানের সূত্র ব্যাখ্যা করেন। বস্তুত এ্যান্টিডুরিং মার্কসবাদের একখানি মৌলিক গ্রন্থ। মার্কসবাদের মূল প্রশ্নসমূহের প্রাঞ্জল আলোচনা গ্রন্থখানিকে জনপ্রিয় চিরায়ত সৃষ্টিতে পরিণত করেছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভি. আই. লেনিন

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন (১৮৭০-১৯২৪ খ্রি.) মার্কস এবং এঙ্গেলসের উত্তরসূরি। মার্কসবাদ তথা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তিনি ছিলেন ব্যাখ্যাতা এবং বিপ্লবী দার্শনিক। লেনিন রুশদেশে সংঘটিত ১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা।

মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী পরিবারের সন্তান লেনিন কিশোর বয়স থেকেই সক্রিয়ভাবে দেশের রাজনীতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। জারকে হত্যা করার চেষ্টার অভিযোগে তার অগ্রজের ফাঁসি লেনিনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। লেনিন দেশের রাজনীতিক আন্দোলনে অধিকতর অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। কিন্তু তিনি তার ভাইয়ের সন্ত্রাসবাদী পন্থা পরিত্যাগ করে বিপ্লবী গণসংগঠনের মাধ্যমে সামাজিক বিপ্লব সাধনের নীতি গ্রহণ করেন। ১৭ বছর বয়সে লেনিন ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে প্রথম গ্রেপ্তার হন। তাঁকে একটা গ্রামে অন্তরীণাবদ্ধ করে রাখা হয়। ১৮৯১ সালে ২১ বছর বয়সে লেনিন সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহির্ছাত্র হিসেবে আইনশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন। লেনিন গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে মার্কসবাদ অধ্যয়ন করতে থাকেন এবং সক্রিয়ভাবে ১৮৮৯-৯০ খ্রিস্টাব্দে একটি মার্কসবাদী চক্র প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৯৪ সালে ২৪ বছর বয়সে লেনিন 'জনতার মিত্র কারা এবং সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের পদ্ধতি কি'—এই শিরোনামে তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক তত্ত্বমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯০০ সালের দিকে তিনি নিজ দেশ পরিত্যাগ করে ইউরোপের অন্যদেশে গমন করেন এবং দেশের বাইরে থেকে বিপ্লবী 'ইসক্রা' পত্রিকা প্রকাশ করে রাশিয়ায় প্রেরণ করে রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। ১৯০৩ সালে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির অভ্যন্তরে তাঁর বিপ্লবী বলশেভিক দলের প্রতিষ্ঠা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯০৫ সালে রাশিয়ায় অভ্যুত্থান ঘটে। এই অভ্যুত্থান জারের নির্মম অত্যাচারে পর্যুদস্ত হয়। ১৯০৫ এবং ১৯১৭ সালের উভয় বিপ্লবে লেনিন প্রত্যক্ষ নেতৃত্বদান করেন।

বিশ শতকের ইতিহাসের নতুন পর্যায়ের সমস্যার বিচার, বিশ্লেষণ ও সমাধানে মার্কসবাদের সৃজনশীল ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগের মধ্যেই লেনিনের কৃতিত্ব নিহিত। লেনিন ১৯১৬ সালে তার 'সাম্রাজ্যবাদ—পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' শীর্ষক সুবিখ্যাত গ্রন্থে বিশ শতকের প্রথম পাদে পুঁজিবাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের সুনিপুণ বিশ্লেষণ উপস্থত করেন এবং সেই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পুঁজিবাদের বিকাশের বিধান উদঘাটিত করেন। এই বিশ্লেষণ অত্যাসন্ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এক শক্তিশালী আদর্শগত হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। লেনিনের এই গ্রন্থ তাঁর অন্যান্য সামাজিক দার্শনিক সমস্যার ওপর লিখিত বহুসংখ্যক গ্রন্থের ন্যায় সমাজ বিকাশের মৌলিক সূত্রের প্রাঞ্জল উপস্থাপনার জন্য বিপ্লবী কর্মী এবং সমাজবিজ্ঞানীর নিকট চিরায়ত সাহিত্যের রূপ লাভ করেছে। বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের অসম বিকাশের বাস্তব অবস্থাকে বিশ্লেষণ করে লেনিন প্রমাণ করেন, এমন অবস্থায় একটি বিশেষ দেশেও সমাজতন্ত্র কায়েম হতে পারে। ইতিপূর্বে ধারণা করা হতো যে, বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের যে শক্তি ও বিকাশ তাতে বিচ্ছিন্নভাবে কোনো একটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে বিশ্বব্যাপী একই সময়ে তা প্রতিষ্ঠিত হবে। বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নিয়ত বিকাশের ওপর লেনিন সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯০৮ সালে রচিত তাঁর 'ম্যাটেরিয়ালিজম অ্যান্ড এমপিরিও ক্রিটিসিজম' গ্রন্থ তাঁর মৌলিক দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ হিসেবে সুপরিচিত। মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিকৃতির অপচেষ্টাকে লেনিন তাঁর এই গ্রন্থে আপোষহীনভাবে বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করেন। এই বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কার ও তত্ত্বসমূহ সম্পর্কে এবং জ্ঞানের সমস্যায় তাঁর মতামত উপস্থিত করেন। শ্রেণী এবং শ্রেণীসংগ্রাম, রাষ্ট্র এবং বিপ্লব প্রভৃতি সমস্যা বিশ্লেষণ করে লেনিন একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাছাড়া তিনি সংস্কৃতি, সমাজতান্ত্রিক শিল্প, সাহিত্য এবং চারিত্রনীতি প্রভৃতি সমস্যার ওপরও আলোকপাত করেন। লেনিনের ভাবধারাকে লেনিনবাদ বলে অভিহিত করা হয়। লেনিনবাদ মার্কসবাদের নতুনতর বিকাশের স্মারক।

Meterialism and Empirio-Criticism : লেনিনের দার্শনিক গ্রন্থ : 'বস্তুবাদ এবং নব-অভিজ্ঞতাবাদ'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের ব্যর্থতার পরবর্তী পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে নানা দার্শনিক বিভ্রান্তির প্রকাশ দেখা যায়। ম্যাক, আভানারিয়াস প্রমুখ চিন্তাবিদ ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে 'এ্যামিপিরিও-ক্রিটিসিজম' নামক এক তত্ত্ব দাঁড় করান। রুশ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে এ তত্ত্বের অনুসারীদের লেনিন 'ম্যাকিসটস' বলে আখ্যায়িত করেন। এ তত্ত্বের মূল বিভ্রান্তির দিক উন্মোচন করে তার যে বিশ্লেষণ লেনিন রচনা করেন তাঁর সেই রচনা 'ম্যাটেরিয়ালিজম অ্যান্ড এমপিরিও-ক্রিটিসিজম' নামে ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয়। লেনিন এই তাত্ত্বিকদের আলোচনা করে বলেন, আন্দোলনের বিপর্যয়কালে যেখানে প্রয়োজন দ্বান্দ্বিক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল সত্যকে সংশোধনবাদের আঘাত থেকে রক্ষা করা, রুশ 'ম্যাকিসটস'গণ সেখানে সংশোধনবাদী নব-অভিজ্ঞতাবাদের 'অন্তর্বাদী' বা 'সাবজেকটিভ' ভাববাদ এবং জ্ঞানের প্রশ্নে অজ্ঞেয়বাদকে প্রচার করার চেষ্টা করেছেন। বাজারভ, বোগদানভ, লুনাচারস্কি প্রমুখ সমাজতন্ত্রী বুদ্ধিজীবী সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে গ্রহণ করেছেন রহস্যবাদ এবং হতাশাবাদকে। অভিজ্ঞতাবাদ, উপলব্ধিবাদ, প্রতীকবাদ প্রভৃতি নতুন নতুন শব্দের আড়াল দিয়ে তাঁরা বিকৃত করার চেষ্টা করেছেন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ তথা মার্কসবাদকে। লেনিনের এ গ্রন্থ ভাবধারার ক্ষেত্রে সংগ্রামের প্রশ্নে তাঁর আপোষহীনতারও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাজারভ, বোগদানভ, লুনাচারস্কি এরাও সমাজতন্ত্রের কথা বলেন, কাজেই তাঁদের আক্রমণ করে রুষ্ট না করে তাঁদের সঙ্গে আপোষের প্রস্তাব করলে লেনিন লেখক গোর্কিকে বলেছিলেন : 'আপনি নিশ্চয়ই একদিন স্বীকার করবেন যে, আদর্শের ক্ষেত্রে কোনো মতকে যদি দলের কর্মী স্বপ্রত্যয়ে ভ্রান্ত এবং ক্ষতিকর বলে জানে, তবে সে ভ্রান্ত এবং ক্ষতিকর মতের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করাই তার অনিবার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়; তার সঙ্গে আপোষ করা নয়।' লেনিন তাঁর এই গ্রন্থে বার্কলে, কান্ট, হিউম প্রভৃতি আধুনিক মুখ্য ভাববাদীদের দর্শনসহ সমগ্র ভাববাদের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তিতে, তার বিশিষ্ট রচনাশৈলীতে তীক্ষ্ণ সমালোচনা উপস্থিত করেন। লেনিনের 'ম্যাটেরিয়ালিজম অ্যান্ড এমপিরিও-ক্রিটিসিজম' সংগ্রামী দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক সংযোজন (দ্র. Empirio-Criticism : নব-অভিজ্ঞতাবাদ, ইন্দ্রিয়ানুভূতিবাদ)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~